রাজগৃহ ও নালন্দা

গ্রন্থকার - প্রণীত

A Critical Introduction to the Paṇhāvāgaraṇāiṃ

হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে Doktor der Philosophie উপাধি - প্রাপক শ্বেতাম্বর - জৈনশাস্ত্রের দশম 'অঙ্গ' - বিষয়ে গবেষণাগ্রন্থ।

Schools and Sects in Jaina Literature. বিশ্বভারতী

জৈনধর্ম। বিশ্বভারতী

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

বুদ্ধকথা

অশোকলিপি

প্রাচীন ভারত-চীন

রাজগৃহ ও নালন্দা

ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন
এম. এ., ডি. ফিল্. (হামবুর্গ)

ভারতবিদ্যাবিহার
কলিকাতা

আশ্বিন, ১৩৫৮॥অক্টোবর, ১৯৫১

প্রকাশক শ্রীবাণী মুন্সি
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিসিটি সোসাইটি
২১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪
মুদ্রাকর শ্রীকালিদাস মুন্সি
পুরাণ প্রেস
২১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪

নিবেদন

মোহেন্‌জোদড়ো, হড়প্পা ও তক্ষশিলা আজ ভারতবহির্ভূত হওয়ায় রাজগৃহই এখন ভারতের প্রাচীনতম প্রত্নক্ষেত্র। নালন্দা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র প্রাচীন - এশিয়ার গৌরবময়ী জ্ঞানধাত্রী।

এই পুস্তিকার প্রকাশ অনেকের সহৃদয় আগ্রহে সম্ভব হইয়াছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন পাণ্ডুলিপি শোধন হইতে আরম্ভ করিয়া চিত্রসংগ্রহ ও গ্রন্থন - সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে সযত্ন শ্রমস্বীকারপূর্বক আমার প্রভূত আনুকূল্য করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার বর্ধনে পরমোৎসাহী শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দত্ত তাঁহার বহুমূল্য গ্রন্থন - অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়া নানাভাবে আমার সহায়তা করিয়াছেন।

রচনাটি 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। দেশ পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ ও কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকার প্রবন্ধ প্রকাশ ও চিত্র নির্বাচনে বহু যত্ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে প্রকাশিত চিত্রগুলি শ্রীযুক্ত ইন্দ্র দুগার কর্তৃক অঙ্কিত। নালন্দার আলোকচিত্রাবলী শ্রীযুক্ত আর্যকুমার সেন কর্তৃক এবং অন্যান্য আলোক-চিত্র শ্রীযুক্ত অঞ্চল মজুমদার কর্তৃক গৃহীত। চিত্রগুলি প্রথমে দেশ পত্রে প্রকাশিত হয়; এই গ্রন্থে সেগুলি পুনর্মুদ্রণ করিবার অনুমতি দিয়া শিল্পীগণ ও দেশ - কর্তৃপক্ষ আমাকে ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ভারত বিদ্যা - প্রচারোৎসাহী শ্রীযুক্ত কালিদাস মুন্সি গ্রন্থের মুদ্রণে বহু যত্ন স্বীকার ও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণদ্বারা আমার গুরুভার হরণ করিয়াছেন।

ইঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

অমূল্যচন্দ্র সেন

সূচী

মাকে



রাজগৃহের পথ

প্রাচীন রাজগৃহের বর্তমান নাম হিন্দি বানানে রাজগীর। ইহা পাটনা জেলার বিহার সবডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পাটনা জংশনের ২৮ মাইল পূর্বদিকে বখ্‌তিয়ারপুর জংশন ; বখ্‌তিয়ারপুরে গাড়ী বদল করিতে হয়। এখান হইতে বখ্‌তিয়ারপুর - বিহার লাইট রেলওয়ে নামক একটি ছোট রেল লাইন আরম্ভ হইয়া রাজগীরে শেষ হইয়াছে ; দূরত্ব ৩৩ মাইল। পথে বখ্‌তিয়ারপুর হইতে ১৮ মাইল পরে বিহার - শরীফ ষ্টেশন, ইহা বিহার সবডিভিশনের সদর। প্রাচীন উদ্দণ্ডপুর বা ওদন্তপুরী এখানে অবস্থিত ছিল। বিহার - শরীফ হইতে ৮ মাইল পরে নালন্দা। নালন্দা হইতে ৭ মাইল পরে রাজগীর, মধ্যে সিলাও নামক একটি ষ্টেশন।

পাটনা বা মুঙ্গের হইতে রাঁচি বা গয়ার দিকে যে সব বাস চলে তাহাও বিহার - শরীফ হইয়া যায়। বিহার - শরীফ হইতে গয়া - রাঁচির

মোটরপথে (রাজগৃহের পথে নয় কারণ বিহার-শরীফ হইতে বড় মোটররাস্তা ছাড়িয়া একটি শাখারাস্তা রাজগৃহে গিয়াছে) ১৬ মাইল দূরে জৈনদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান পাবাপুরী; এখানে জৈনদের শেষ তীর্থংকর মহাবীর দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। পাবাপুরীর মন্দিরাদি অতি আধুনিক কালে নির্মিত। বিহার-শরীফ হইতে রাজগীর পর্যন্ত বাসেও যাতায়াত করা যায়।

বখ্‌তিয়ারপুর হইতে বিহার-শরীফ পর্যন্ত ছোট রেল লাইন ও মোটরপথ সোজা ও খুব পাশাপাশি গিয়াছে। তাহার পর রাজগীর পর্যন্ত শাখাপথ ও রেল লাইন আঁকিয়া বাঁকিয়া কখনও পরস্পরকে কাটাকাটি করিয়া গিয়াছে। নালন্দা ষ্টেশন হইতে প্রাচীন মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ ও তাহার সন্নিকটের মিউজিয়ম প্রায় দুই মাইল পথ। নালন্দায় কোন যানবাহন, থাকিবার বা আহারাদির স্থান নাই। তাই সঙ্গে জিনিষপত্র থাকিলে ও আহার্যাদি না থাকিলে সোজা রাজগীরে গিয়া সেখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া পরে সুবিধামত নালন্দা দেখা ভাল। সকাল হইতে প্রায় প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর রাজগীর-নালন্দা যাতায়াতের ট্রেন পাওয়া যায়। ধ্বংসাবশেষ ও মিউজিয়ম দেখিতে অন্তত ৩ ঘণ্টা সময় দেওয়া উচিত। সিলাও ষ্টেশনের কাছেই বাজার; এখানকার চিঁড়া ও খাজা প্রসিদ্ধ।

সিলাও ষ্টেশনের পর হইতেই রাজগীরের পাহাড়গুলির পূর্বদিকের অংশ অর্থাৎ প্রথমে শৈলগিরি, তারপর ছঠাগিরি ও ক্রমে বিপুলগিরি (মানচিত্র ১) চোখে পড়ে। রাজগীরে দুই-একখানি এক্কা ও ডুলি ছাড়া কোন যানবাহন পাওয়া যায় না। বাজার, ধর্মশালা ও অন্যান্য

বাসস্থান ষ্টেশন হইতে অর্ধ মাইলের মধ্যে। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া ডান (উত্তর) দিকে বাজার ধর্মশালা গ্রাম প্রভৃতি এবং বাম (দক্ষিণ) দিকে ব্রহ্মদেশীয় মন্দির, ইন্স্পেক্শন বাংলো, রেষ্ট হাউস, জাপানী মন্দির এবং উষ্ণ প্রস্রবন ও পর্বতমালাবেষ্টিত প্রাচীন দ্রষ্টব্য স্থানগুলি।

প্রাচীন ইতিহাসের আকর

রাজগৃহের তথা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে আকর - গ্রন্থগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের মধ্যেও প্রাচীন যা কিছু সব সম্বন্ধেই কিম্বদন্তী বা শাস্ত্রোক্তি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া নির্বিচারে গ্রহণ করিবার অভ্যাস এবং প্রাচীন মাত্রকেই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর পুরাতন বলিয়া মনে করিবার ইচ্ছা দেখা যায়। ইহা বৈজ্ঞানিক - প্রণালীসম্মত তুলনা ও যুক্তিমূলক ঐতিহাসিক বিচার - আলোচনার পদ্ধতি নয়। এ বিষয়ে পণ্ডিতদের বহু গবেষণা ও চর্চার সারমর্ম অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি।

কোন প্রাচীন শাস্ত্র বা গ্রন্থ মানুষ ছাড়া আর কাহারও দ্বারা লিখিত নয়। তাই এ সবেতে বহু উক্তির বিভিন্নতা, বিরোধ এমন কি ভুলভ্রান্তিও দেখা যায়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগুলির অধিকাংশ একদিনে একজনের দ্বারা লিখিত হয় নাই ; কয়েক যুগ ধরিয়া রচিত অনেকের রচনা অনেকদিন লোকের মুখে মুখে চলিয়া কোন এক সময়ে একত্র সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয় এবং তাহার পরও তাহাতে অনেকদিন ধরিয়া জোড়াতালি চলে। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র ও গ্রন্থাদির লেখক বা রচনাকাল, গ্রন্থকার ও অন্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবন - কাল, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সময় প্রভৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ঠিক নির্ধারণ করা যায় না, একটা মোটামুটি ধারণা লইয়া কাজ চালাইতে হয়।

ভারততাত্ত্বিক ঐতিহাসিকদের মতে বৈদিক সংহিতার প্রাচীন অংশগুলি খৃ. পূ. অনুমান ১৬ - ১৩ শতকের মধ্যে রচিত। অথর্ববেদের শেষাংশ, ঐতরেয় তৈত্তিরীয় শতপথ প্রভৃতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাচীন অংশগুলি অনুমান খৃ. পূ. ৯ - ৬ শতকের মধ্যে রচিত। মহাভারতের রচনাও এই সময় হইতে আরম্ভ হয় এবং খৃ. ৩ শতক পর্যন্ত তাহা পরিবর্ধিত হইতে থাকে। মহাভারতবর্ণিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সম্ভব অনুমান খৃ. পূ. ৯ শতকের ঘটনা। রামায়ণ অনুমান খৃ. পূ. ৩ - ২ শতকে প্রথম রচিত হইয়া পরে আরও পরিবর্ধিত হয়। পুরাণগুলিতে অনেক প্রাচীন কাহিনী ও কিম্বদন্তী সংগৃহীত হইলেও এখন পুরাণগুলিকে যে মূর্তিতে দেখা যায় তাহার রচনা সম্ভব খৃ. ৩ শতকের পূর্বে নয়। ভাগবত - পুরাণখানি আরও অনেক পরবর্তী কালের, সম্ভব খৃ. ১০ শতকের রচনা।

বুদ্ধের জন্ম হয় অনুমান খৃ. পূ. ৫৬৩ এবং মৃত্যু হয় অনুমান খৃ. পূ. ৪৮৩। জৈনতীর্থংকর মহাবীর, রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রু বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটক পালিভাষায় রচিত। অনেকদিন মুখে মুখে চলিয়া অনুমান খৃ. পূ. ২ শতকে ইহার সুত্তনিপাত, বিনয়পিটক ও জাতকগুলি লিপিবদ্ধ হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ অনুমান খৃ. ৫ শতকের লোক। সিংহলের পালি ঐতিহাসিক গ্রন্থ মহাবংস অনুমান খৃ. ৬ শতকে রচিত। অন্যান্য বৌদ্ধটীকাদিও পরবর্তী কালের রচনা।

শ্বেতাম্বর - জৈন শাস্ত্রের অংশবিশেষ রচনার পর বহুদিন মুখে মুখে প্রচলিত ও পরিবর্ধিত হইতে থাকে এবং অনুমান খৃ. ৬

শতকে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। দিগম্বর - জৈনরা এই শাস্ত্র প্রামাণিক বলিয়া মানেন না। দিগম্বররা শাস্ত্রতুল্য বলিয়া যে গ্রন্থগুলিকে মানেন তাহা সবই খৃষ্টপর যুগের রচনা।

চীনদেশের সঙ্গে ভারতের সংযোগ, চীনা পরিব্রাজকদের ভারত - ভ্রমণ ও ভারতীয় পণ্ডিতদের চীনদেশে গমনাগমন চলিয়াছিল খৃ. ১ হইতে ১১ শতক পর্যন্ত। চীনা পরিব্রাজকদের মধ্যে ফা হিয়েন ১৪ বছর (খৃ. ৪০০ - ৪১৪), হিউয়েন ৎসাং ১৬ বছর (খৃ. ৬২৯ - ৬৪৫) এবং ই ৎসিং ২৪ বছর (খৃ. ৬৭১ - ৬৯৫) ভারতে কাটাইয়াছিলেন। রাজগৃহ ও নালন্দা সম্বন্ধে বহু সংবাদ আমরা চীনা পরিব্রাজকদের নিকট পাইয়াছি।

চীনের মত তিব্বতের সঙ্গেও ভারতের সংযোগ ও আদান - প্রদান চলিয়াছিল খৃ. ৮ হইতে ১৩ শতক পর্যন্ত। নালন্দা বিক্রমশিলা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য আমরা জানি তিব্বতী গ্রন্থ হইতে। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথ সম্ভব খৃ. ১৬ - ১৭ শতকের লোক।

এই পুস্তিকাটি প্রণয়নে প্রাচীন শাস্ত্র ও গ্রন্থাদি ছাড়া সরকারী ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ (Archaeological Department) কর্তৃক প্রকাশিত বিবিধ সন্দর্ভাদি ব্যবহার করিয়াছি। তা ছাড়া যে সব প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও অন্যান্য লেখকের মতামত ও তথ্যাদি গ্রহণ করিয়াছি, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

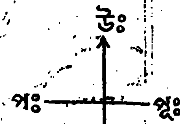
প্রাগৈতিহাসিক যুগের মগধ

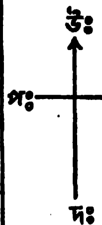
প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহের আর একটি নাম গিরিব্রজ। লক্ষ্য করিবার বিষয়, গিরিব্রজ-রাজগৃহ নামে উত্তর - পশ্চিম ভারতেও একটি নগর ছিল। রামায়ণে দেখা যায় ইহা ছিল কেকয় দেশের রাজধানী। কেকয় দেশ বা কেকয় জাতির উল্লেখ ঋগ্বেদে নাই কিন্তু শতপথব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য - উপনিষদে আছে; রামায়ণ - মহাভারতেও কেকয়রা সুবিজ্ঞাত। দশরথপত্নী ভরতমাতা কৈকেয়ী এই দেশের রাজা অশ্বপতির কন্যা ছিলেন। কুরুক্ষেত্র - যুদ্ধে কেকয় দেশ কুরুপক্ষে যোগ দিয়াছিল। রামায়ণের বর্ণনায় কেকয় দেশ বিপাশা নদী (আধুনিক বিয়াস্) হইতে পশ্চিমে গান্ধার দেশের (আধুনিক কাবুল অঞ্চল) সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জেনারেল কানিংহাম ঝিলম্ নদীতীরস্থ জালালপুরের নিকটবর্তী আধুনিক গির্‌য়াক নামক স্থানে কেকয় দেশের রাজধানী গিরিব্রজ - রাজগৃহের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের আধুনিক রাজগীরের কাছেও, পূর্বদিকে ৭ মাইল দূরে, গিরিয়াক নামে একটি স্থান আছে। সম্ভব গিরি + অগ্র = গির্যগ্র হইতে এই নামের উদ্ভব হয়, অর্থাৎ যাহা পাহাড়ের আগে (অল্প বাহিরে, কাছে) অবস্থিত। কেকয় দেশের গিরিব্রজ - রাজগৃহ হইতে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য মহাভারত, রামায়ণ ও বৌদ্ধ বিনয়পিটকে আমাদের রাজগৃহকে সর্বদা "মাগধদের গিরিব্রজ (বা রাজগৃহ)" বলা হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশে একই নামের স্থান থাকিলে প্রায়ই দেখা যায় তাহার কারণ এক দেশের লোক অন্য দেশে গিয়া বসতি বা নগরাদি স্থাপন করিয়াছে, যেমন ইংলণ্ডের লোক উত্তর - আমেরিকায় গিয়া নিউ - ইংলণ্ড, নিউইয়র্ক প্রভৃতির স্থাপনা করে,বিহারের রোহতাস্‌গড়ের অধিপতি শের শা পঞ্জাব জয় করিয়া সিন্ধুনদের তীরে রোহতাস্ নামে দুর্গ স্থাপনা করেন। উত্তর ভারতের মথুরা (=মধুরা) হইতে দক্ষিণ ভারতের মদুরা নগরের নামকরণ হয় আবার দক্ষিণ ভারতের লোক শ্যাম সুমাত্র যব বলি প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নূতন দেশে মদুরা ও অন্য বহু দক্ষিণভারতীয় নগরের নাম দিয়া নগর স্থাপনা করে। অতএব এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, কেকয়ের ও মগধের গিরিব্রজ-রাজগৃহ-গিরিয়াকের মধ্যে ঐরূপ কোন যোগসম্বন্ধ থাকিতে পারে। কেকয়ের লোক মগধে আসিয়াছিল, না মগধের লোকই কেকয়ে গিয়াছিল ?

পঞ্জাবের উত্তর - পশ্চিমে বক্ষু নদীর (আধুনিক Oxus) তীরে বাল্‌খ্ (প্রাচীন বাহ্লিক) প্রদেশে হিউয়েন ৎসাং রাজগৃহ নামে তৃতীয় আরও একটি নগর দেখিয়াছিলেন। ইহাকে ছোট - রাজগৃহ বলা হইত। রাজার গৃহ অর্থাৎ রাজধানী অর্থে যে কোন দেশের প্রধান নগরের নাম রাজগৃহ হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু তথাপি বাহ্লিক ও কেকয়ের রাজগৃহের মধ্যে কোন সংযোগ থাকা হয়ত সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। সম্ভবত কেকয় জাতির কোন শাখা পরবর্তী কালে বাহ্লিকদেশে গিয়া "ছোট" রাজগৃহের স্থাপনা করিয়াছিল।

পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে যে, কেকয় জাতি অনার্য অনুনামক জাতি হইতে উদ্ভূত। জৈন শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে যে, কেকয় দেশের


'নূতন' রাজগৃহ
অশোক স্তূপ
উত্তর-দ্বার
সপ্তপর্ণী স্তূপ ?
বিপুলগিরি
শৈলগিরি
পূর্ব-দ্বার
ছটাগিরি
রত্নগিরি
বৈভারগিরি
রাজগৃহ গিরিব্রজ
অশোক স্তূপ
গৃধ্রকূট
মদ্দকুচ্ছি
উদয়গিরি
জীবকাম্রবন
রণভূমি
সোনাগিরি
বানগংগা নদী
দক্ষিণদ্বার
উঃ
পঃ
পূঃ
দঃ
১নং মানচিত্র
নগর প্রাচীর
গিরিপ্রাকার


অর্ধেন্দু দত্ত
উঃ
পঃ
পূঃ
দঃ
অশোক স্তূপ
'নূতন' রাজগৃহ
রেলস্টেশন
বর্মী মন্দির
জাপানী মন্দির
খাল
কলন্দক নিবাপ
বেণুবন
অশোকারাম
মখদুম কুণ্ড
সূর্য কুণ্ড
গিরি প্রাকারের উত্তর-দ্বার
নগর প্রাচীরের উঃ পশ্চিম দ্বার
নগর প্রাচীরের উত্তর-দ্বার
বিপুল গিরি
সপ্তপর্ণী স্তূপ?
পিপ্পলী গুহা
সপ্তপর্ণী গুহা
জরাসন্ধকী বৈঠক
সপ্তধারা
বৈভার গিরি
সোন ভাণ্ডার
খাল
২নং মানচিত্র
নগর প্রাচীর
বর্তমান রাস্তা
বিম্বিসার-যুগের রাস্তা
রত্ন গিরি
মনিয়ার মঠ
গিরিব্রজ-রাজগৃহ
কুশাগ্রপুর
নগর প্রাচীরের-
দঃ পশ্চিম দ্বার
সরস্বতী নদী (তেপোনা)
কারাগার
খাল
স্তূপ
জীবকাম্রবন
গৃধ্রকূট
নগর প্রাচীরের পূর্ব-দ্বার
দক্ষিণ দ্বার
খাল
শৈল-লিপি
সোনা গিরি
উদয় গিরি
স্তূপ
গিরিপ্রাকারের দক্ষিণ দ্বার
বাণগঙ্গা

অর্ধেকমাত্র আর্য। ঋগ্বেদের ৮ মণ্ডলে দেখা যায় যে, অনুজাতির বাসস্থান ছিল পঞ্জাবের ঠিক সেই অঞ্চলে যাহা রামায়ণে কেকয়দেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের বর্ণনায় কেকয় ও বাহ্লিক দেশদ্বয়ের মধ্যে খুব নিকটসম্বন্ধ দেখা যায় এবং পুরাণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, মদ্রদেশের (লাহোরের পশ্চিমাঞ্চল) সঙ্গে কেকয়জাতি ঘনিষ্ঠ - সম্বন্ধ। এইসব কারণে মনে হয় যে, আর্যরা যখন উত্তর - পশ্চিম হইতে ভারতে প্রবেশ করে তখন তাহাদের দ্বারা বিজিত ও তাহাদের সঙ্গে কিছু পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া অনার্য অনুজাতির বংশধর কেকয়গণ ক্রমে পূর্বদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে।

"অনার্য" মানেই অসভ্য নয় ; ইহার অর্থ আর্য হইতে বিভিন্ন অন্য জাতি। আর্যদের ভারত - প্রবেশের পর যেসব ভারতবাসী জাতির সঙ্গে আর্যদের যুদ্ধ করিতে হয় তাহাদের মধ্যে অনেক অসভ্য জাতি ছিল সত্য কিন্তু আর্যদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে সুসভ্য জাতিও যে ছিল তাহা আধুনিক ইতিহাসজ্ঞানে সুবিদিত। আর্যরা বাহুবলে এই সুসভ্য ভারতবাসী জাতিদের জয় করিলেও ইহাদেরই সংস্পর্শে অর্ধসভ্য আর্যরা সভ্যতার পথে উন্নতিলাভ করে। ভারতীয় সভ্যতার বহিরাবরণ মাত্র আর্য, ভিতরের অধিকাংশই অনার্য। আর্য ও প্রাগার্য ভারতীয় জাতির সংমিশ্রণে ভারতীয় জাতি ও সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হয়।

দক্ষিণভারতীয় প্রাচীনলিপি হইতে জানা যায় যে, কেকয় জাতির একটি শাখা দক্ষিণভারতে গিয়া মহীশূরে রাজ্য স্থাপন করে ; ইহাদের দ্বারা বোধহয় মহীশূরের একটি প্রাচীন রাজবংশের প্রবর্তন হয়।

কেকয় জাতির অপর কোন শাখা কি পূর্ব - দক্ষিণ ভারতে অগ্রসর হইয়া মগধে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া নিজেদের প্রাক্তন রাজধানীর নামে মগধে গিরিব্রজ - রাজগৃহের স্থাপনা করে ?

অম্বুজাতি - উদ্ভূত অর্ধ - আর্য কেকয়জাতির সঙ্গে মগধের সংযোগ সম্বন্ধে হয়ত আরও একটি প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারা যায়। ঋগ্বেদের ৩ মণ্ডলে কীকট নামক একটি জাতির উল্লেখ আছে। নিরুক্তকার যাস্ক (অনুমান খৃ. পূ. ৫ শতক) কীকট দেশকে "অনার্য - নিবাস" বলিয়াছেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে কীকট দেশকে "পাপভূমি", এই দেশের রাজা কাককর্ণকে "ব্রহ্মদ্বেষকর" এবং এই দেশে গয়া নামক একটি স্থান আছে বলা হইয়াছে। বায়ুপুরাণে আছে যে কীকটদেশে পুণ্যা গয়া, পুণ্য রাজগৃহবন, পুণ্য চ্যবনাশ্রম এবং পুণ্যা পুনঃপুনা (বর্তমান পুন্‌পুনা বা পুন্‌পুন্) নদী আছে। ভাগবতপুরাণে কীকট দেশের উল্লেখ সম্পর্কে টীকাকার শ্রীধর বলিয়াছেন যে গয়া এই দেশে অবস্থিত। এইসব হইতে বেশ বুঝা যায় যে মগধেরই প্রাচীন নাম কীকট। পরবর্তী কালের গ্রন্থকাররাও একথা বলিয়াছেন। অভিধানচিন্তামণিকার হেমচন্দ্র (খৃ. ১২ শতক) স্পষ্ট বলিয়াছেন যে মগধেরই নাম কীকট। অনার্যদের দেশ, অর্থাৎ আর্যরা তখনও তাহা জয় করিতে পারে নাই বলিয়া ইহা আর্য - ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে "পাপভূমি" আখ্যা পাইয়াছিল, এখানকার রাজা ও লোক বৈদিকধর্ম মানিতেন না তাই তাঁহারা "ব্রহ্মদ্বেষকর"।

ঐতিহাসিক যুগে মগধের একজন রাজার নাম কালাশোক বা কাকবর্ণ ছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত ব্রহ্মদ্বেষকর কীকটরাজ কাককর্ণের

নামের "কর্ণ" শব্দটি হয়ত ঐতিহাসিক যুগের মগধরাজ কাকবর্ণের নামের "বর্ণ" শব্দের ভ্রমে জাত, পুঁথি নকল করার সময়ে "ব" স্থানে "ক" হইয়া গিয়াছে। কাকের কানের চেয়ে রংটিই বেশি উপমাযোগ্য। যদিও একদেশে একনামের একাধিক রাজা থাকা মোটেই অসম্ভব নয় কিন্তু ডকটর শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় মনে করেন যে, বৃহদ্ধর্ম - পুরাণের কাককর্ণ ও ইতিহাসের কাকবর্ণ একই ব্যক্তি হইতে পারেন।

অধ্যাপক কীথ্ সাহেব বলেন যে, ঋগ্বেদের কীকটদেশ যদি সত্যই মগধ হয় তবে মগধের প্রতি বিদ্বেষ ঋগ্বৈদিক যুগেও আর্যদের মধ্যে প্রবল ছিল এবং ইহার কারণ খুব সম্ভব এই ছিল যে, এই দেশে অনার্যরক্তের প্রাবল্য ছিল এবং বৈদিকধর্ম এখানে পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, যাহার ফলে পরবর্তী যুগে মগধ বৌদ্ধাদি অবৈদিক ও অব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান ক্ষেত্র হইয়াছিল। কেকয় ও কীকট এই দুই শব্দে কিছু ধ্বনিগত সাদৃশ্যও আছে। হয়ত কেকয়জাতি মগধে আসিয়া কীকট নাম পাইয়াছিল অথবা কীকটজাতি পঞ্জাবে গিয়া কেকয় নাম পাইয়াছিল। ভারতের ইতিহাসে উত্তর - পশ্চিম হইতে বিজেতাদের পূর্ব - দক্ষিণে বিস্তৃতি যেমন, তেমনি মগধ হইতেও উত্তর - পশ্চিমে বিস্তৃতি বহুবার ঘটিয়াছে।

ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, আর্যরা ভারতে প্রবেশের সময়ে এবং তারপর অনেকদিন পর্যন্ত যেসব ভারতবাসী সভ্যজাতির সঙ্গে আর্যদের সঙ্ঘর্ষের কথা ঋগ্বেদ হইতে জানা যায় এবং যাহাদের আর্যরা অসুর দৈত্য দানব দস্যু দাস প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা বা তাহাদের কোন শাখা সিন্ধুনদ উপত্যকার মোহেঞ্জোদড়ো ও

হড়প্পা প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত প্রাচীন সভ্যতার প্রবর্তক। পঞ্জাবের উত্তর ও পশ্চিমে অনেক দূর পর্যন্ত এই সভ্যতার আরও অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই প্রাগার্য প্রাচীন সভ্যতা একটি জাতি বা এক জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা বা বিভিন্ন জাতি কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল কিনা তাহা বলা যায় না, কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক তাহাকে সাধারণভাবে "অসুর" নাম দিয়াছেন। কেহ বলেন "অসুররা", অন্তত তাহাদের কোন কোন শাখা বোলান্-গিরিবর্ত্ম পথে, কেহ বলেন সিন্ধুনদ-মোহানার পথে, কাহারও কাহারও মতে পূর্বাঞ্চল হইতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বিস্তৃত হয়। আর্যদের আক্রমণে পরাজিত হইয়া এই "অসুররা" উত্তর ও পশ্চিম হইতে হটিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। মগধ-রাজগৃহের রাজা জরাসন্ধ ও আসাম-প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত অসুরবংশীয় বলিয়া সুবিদিত ছিলেন। মগধের অতি প্রাচীন স্থান গয়াও গয়াসুর বা গজাসুরের নগরী বলিয়া খ্যাত ছিল। ভারতের প্রাগার্য দ্রবিড় সভ্যতা সম্ভব এই অসুর সভ্যতার বংশধর।

অথর্ববেদে মগধবাসীদের ব্রাত্য অর্থাৎ বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভূত বলা হইয়াছে। সামবেদীয় লাট্যায়নশ্রৌতসূত্রে মাগধব্রাহ্মণদের হীনব্রাহ্মণ ও ব্রাত্য বলা হইয়াছে। পরবর্তী কালের শাস্ত্রাদিতে মগধের লোককে বর্ণসংকরজাত একটি বিশিষ্ট জাতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গৌতমধর্মশাস্ত্র ও মনুসংহিতায় "মাগধ" অর্থে মগধদেশের অধিবাসীদের না বুঝাইয়া বৈশ্যপিতা ও ক্ষত্রিয়মাতার সন্তান বুঝাইয়াছে এবং মনুসংহিতায় মাগধদের বাণিজ্যব্যবসায়ী

ও গায়ক - কথকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে মাগধদের উচ্চ কণ্ঠস্বরের উল্লেখ আছে। শতপথব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে যে, কোশল ও বিদেহে (অর্থাৎ উত্তর - বিহারের পশ্চিম ও পূর্বাংশে) প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণবসতি স্থাপিত হয় নাই এবং মগধে তারও চেয়ে কম হইয়াছিল।

শতপথব্রাহ্মণে আরও বর্ণিত আছে যে, পঞ্জাবের সরস্বতী নদী হইতে পূর্বমুখে অগ্রসর হইয়া অগ্নি (আর্যদের উপাস্য দেবতা অর্থাৎ বৈদিকধর্ম ও বৈদিক প্রভাব) সদানীরানদী (আধুনিক রাপ্তিনদী, গণ্ডকনদের পশ্চিমে) পর্যন্ত আসিয়াছিলেন এবং সদানীরার অপর পারে প্রাচীনকালে কোন ব্রাহ্মণ যাইতেন না। মহাভারতে সদানীরার পূর্বদেশভাগকে "জলোদ্ভব" বলা হইয়াছে অর্থাৎ এ অঞ্চল দক্ষিণ বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলের মত জলময় ছিল, নদীবহুল উত্তর বিহারের নিম্নভূমি তখনও কৃষিহীন ছিল। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দেখা যায় যে, সুগ্রীব সীতান্বেষণে বানর সেনাকে ভারতের সর্বদেশে এবং ভারতের বাহিরেও পাঠাইবার সময়ে মগধকে পূর্বদিকের, যেন ভারতের বাহিরে একটি দেশ বলা হইয়াছে।

এই সব হইতে মনে হয় যে অতি প্রাচীনকালে আর্যব্রাহ্মণ সমাজ মগধকে যে হীনচক্ষে দেখিতেন তার কারণ মগধ তখনও আর্যাধিকারে আসে নাই এবং মগধের লোক সুসভ্য হইলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবাধীন হয় নাই। কিন্তু তথাপি মগধের সঙ্গে যাতায়াত ও বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল, ধর্মব্যবসায়ী পুরোহিতব্রাহ্মণরা বিদ্বেষের চোখে দেখিলেও সাধারণ লোকের মধ্যে মগধের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধও

চলিত ; বাণিজ্য সম্পর্কে মগধের ধনী লোক ভারতে আসিয়া ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিত। বাণিজ্য - সমৃদ্ধি, শিল্পকৌশল ও বিবিধ পণ্যদ্রব্যের জন্য মগধের খ্যাতি ছিল। রামায়ণে মগধকে অতি সুসভ্য দেশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কৈকেয়ীর ক্রোধশান্তির জন্য দশরথ তাঁহাকে মগধজাত শিল্পদ্রব্যাদি উপহার দিবার প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। কালক্রমে যখন মগধ কিছু পরিমাণে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ও আর্যাধিকারের অধীন হয় তখন গয়া চ্যবনাশ্রম পুন্‌পুনানদী রাজগৃহ প্রভৃতি স্থান ব্রাহ্মণদের কাছে ক্রমে "পুণ্য" বলিয়া বিবেচিত হইতে আরম্ভ করে।

জরাসন্ধের যুগে রাজগৃহ

পুরাণে বর্ণিত আছে কুরুর পুত্র ছিলেন সুধন্বা, সুধন্বার পর চতুর্থ রাজা বসু মগধ জয় করিয়া রাজধানী গিরিব্রজসহ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বৃহদ্রথকে দান করেন এবং বৃহদ্রথ সেখানে বার্হদ্রথ - রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। রামায়ণের আদিকাণ্ডে কিন্তু আছে ব্রহ্মার চতুর্থ পুত্র বসু গিরিব্রজে রাজধানী স্থাপনা করিয়াছিলেন। বসু হইতে রামায়ণে গিরিব্রজের একটি নাম "বসুমতী" বলা হইয়াছে। বৃহদ্রথপুত্র জরাসন্ধের রাজধানী বলিয়া আর একটি নাম "বার্হদ্রথপুর।" মৎস্যপুরাণে জরাসন্ধের বহু বংশধরদের নামের মধ্যে একজনের নাম আছে কুশাগ্র এবং আর একজনের নাম বৃষভ; সম্ভব ইহা হইতেই গিরিব্রজের জৈনসাহিত্যোক্ত "কুশাগ্রপুর" ও "বৃষভপুর" নামদ্বয়ের উৎপত্তি হয়। হিউয়েন ৎসাং কুশাগ্রপুর বা কুশাগারপুর নামের ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন যে, রাজগৃহে উৎকৃষ্ট কুশ (সুগন্ধি ঘাস, খশ্‌খশ্‌) জন্মে বলিয়া ঐ নামের উৎপত্তি হয়। এ ব্যাখ্যা পরবর্তী কালের বৌদ্ধদের কল্পনাপ্রসূত, যাঁহারা পৌরাণিক কাহিনীর বিশেষ ধার ধারিতেন না; যদিও একথা সত্য যে রাজগৃহ অঞ্চল উত্তম খশ্‌খশ্‌ ঘাসের জন্য প্রসিদ্ধ।

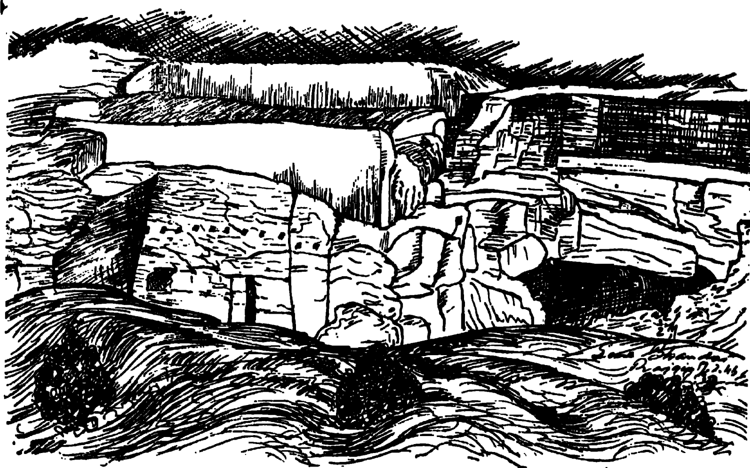
টীকাকার বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন রাজগৃহ মান্ধাতা কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল; এই কিম্বদন্তীতে সূচনা করে যে, রাজগৃহের স্থাপনা অতি প্রাচীনকালে হইয়াছিল। বৌদ্ধরা বলেন মহাগোবিন্দ নামক একজন

স্থপতি রাজগৃহনগর নির্মাণ করেন। গিরিব্রজ নামের "ব্রজ" শব্দের অর্থ দুর্গ, গোচারণভূমি নয়। প্রাচীন সাহিত্যে গিরিব্রজকে সর্বত্র পর্বতবেষ্টিত সুরক্ষিত দুর্গস্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাভারতের বর্ণনায় আছে গোরথগিরি হইতে মগধের রাজধানী দেখা যাইত। ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া ও জ্যাক্সন সাহেব দেখাইয়াছেন যে, গয়ার নিকটবর্তী বরাবর - পাহাড়কে গোরথগিরি বলা হইত; ইহা পরে প্রবরগিরি নামে আখ্যাত হয় এবং 'প্রবর' শব্দ হইতে 'বরাবর' শব্দের উৎপত্তি হয়।

মহাভারতের সভাপর্বে আছে জরাসন্ধ প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং আদিপর্বে বলা হইয়াছে তিনি অসুররাজ বিপ্রচিত্তির অবতার ছিলেন; ইহাতে তাঁহার অনার্য "অসুর" - জাতিত্ব সূচনা করে। বিপ্রচিত্তি ও জরাসন্ধ নাম সম্ভব অনার্য ভাষার শব্দের সংস্কৃতরূপ। জরারাক্ষসী প্রভৃতির কাহিনী সম্ভব কাল্পনিক বা কোন "অসুর" - কিম্বদন্তীপ্রসূত। বিষ্ণুপুরাণে আছে জরাসন্ধ মথুরার রাজা কংসের সঙ্গে দুই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধের পর কৃষ্ণকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে জরাসন্ধ বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে মথুরা আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। মহাভারত ও ব্রহ্মপুরাণে আছে মথুরা আক্রমণের সময়ে জরাসন্ধ উত্তর ভারতের অনেক রাজাদের পরাজিত ও বন্দী করিয়া আনিয়া গিরিব্রজে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং শিবের কাছে ঐ রাজাদের বলি দিতেন। হরিবংশে আছে মথুরা আক্রমণের সময়ে জরাসন্ধ কৃষ্ণভ্রাতা বলরামের রথের ঘোড়া মারিয়া



রাজগীর ষ্টেশনের বাহিরে মূষিক-আহারী "অস্পৃশ্য" আদিবাসীগণের ঝুপ্‌ড়ি পৃ ২



সোনভাণ্ডার — জীর্ণসংস্কারের পূর্বে পৃ ৬৭ - ৬৮

ফেলিয়াছিলেন। মহাভারত - শান্তিপর্বে আছে যে, কর্ণের শৌর্যখ্যাতি শুনিয়া জরাসন্ধ কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও পরাজিত হন; কর্ণের বীরত্বে প্রীত হইয়া তিনি কর্ণকে মালিনী - নগরীর রাজা করেন। জরাসন্ধ এত প্রতাপশালী ছিলেন যে তাঁহাকে পরাস্ত না করিয়া যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া একচ্ছত্রাধিপত্য লাভ করিতে পারেন নাই। মহাভারত ও ভাগবত - পুরাণে আছে ভীম ও অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ গিরিব্রজে যান এবং সেখানে ভীম জরাসন্ধকে বধ করার পর কৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়া জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দীকৃত রাজাদের কারাগারমুক্ত করেন। বৌদ্ধরা বলিয়াছেন বহু প্রাচীন কাল হইতে বহু রাজা এখানে রাজত্ব করায় রাজধানীর নাম রাজগৃহ হয়, আবার পুরাণকাররা বলিয়াছেন যে জরাসন্ধ বহু রাজাকে এখানে বন্দী করিয়া রাখায় গিরিব্রজের নাম রাজগৃহ হয়। এই দুই ব্যাখ্যাই অলীক। আসলে রাজগৃহ মানে রাজার বসতিস্থান বা রাজধানী।

জরাসন্ধের সঙ্গে উত্তরভারতীয় আর্যজাতীয় রাজাদের বিরোধের কাহিনীতে প্রাচীন যুগের আর্য - অসুর বিরোধের ছায়া পাওয়া যায়। অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে, মগধ বহুদিন পর্যন্ত আর্যাধিকার প্রতিরোধ করিয়াছিল এবং মগধের "অসুর" বিক্রমের সঙ্গে আর্যরা পারিয়া উঠেন নাই। জরাসন্ধের শিবপূজাও অর্থময়। শৈবধর্মের আরম্ভ যে প্রাগার্য যুগে হইয়াছিল তাহা আজকাল ঐতিহাসিকগণের কাছে সুবিদিত। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, শিব বহুদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য -

ধর্মে স্বীকৃত হন নাই এবং অনেক পরে ব্রাহ্মণ্য দেবসভায় গৃহীত হইয়াছিলেন।

জরাসন্ধবধের পরেও আর্যদের মগধজয় সম্পূর্ণ হয় নাই। মহাভারতের সভাপর্বে আছে জরাসন্ধপুত্র সহদেব রাজস্ব না দেওয়ায় ভীম আবার গিরিব্রজে গিয়া সহদেবকে রাজস্ব দানে বাধ্য করেন এবং সহদেব পাণ্ডবদের সামন্তরাজারূপে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে যোগ দেন। উদ্যোগপর্বে আছে জরাসন্ধের আর এক পুত্র ধৃষ্টকেতু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সসৈন্যে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেন; সহদেব সহজে পাণ্ডবদের বশ্যতা স্বীকার না করিলেও ধৃষ্টকেতু হয়ত নিজস্বার্থ বর্ধনের উদ্দেশ্যে পাণ্ডবপক্ষীয় হইয়াছিলেন। অশ্বমেধপর্বে আবার দেখা যায় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়া যখন হস্তিনাপুর অভিমুখে যাইতেছিল তখন সহদেবের পুত্র মেঘসন্ধি ঘোড়া আটকাইয়া অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাজিত হন। মগধের অসুররাজবংশ বার বার আর্যদের রাজচক্রবর্তিত্বের বিরোধিতা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই।

বিম্বিসারের সময়ে রাজগৃহ

পৌরাণিক বর্ণনায় জরাসন্ধের শেষ বংশধর রিপুঞ্জয়ের পর প্রদ্যোত-বংশ মগধের অধীশ্বর হন এবং প্রদ্যোতবংশের পর শিশুনাগ রাজগৃহের সিংহাসন অধিকার করেন। পুরাণমতে বিম্বিসার শিশুনাগের বংশধর ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধ মহাবংসমতে শিশুনাগ বিম্বিসারের পরবর্তী যুগের রাজা। বিম্বিসারের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রাজগণের বংশ নাম পৌর্বাপর্য রাজত্বকাল প্রভৃতি বিষয়ে পুরাণ ও মহাবংসমতে ঘোর বৈষম্য দেখা যায় এবং আধুনিক ঐতিহাসিকরাও এবিষয়ে সম্পূর্ণ একমত নহেন কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক এখন মহাবংসমতেই বেশি আস্থাবান। তাঁহাদের মতে খৃ. পূ. ৬ শতকে বার্হদ্রথ বংশের রাজত্ব শেষ হয়। কাশীরাজ্য তখন খুব প্রতাপশালী; হয়ত অঙ্গদেশ (আধুনিক ভাগলপুর অঞ্চল) পর্যন্ত কিছুকালের জন্য কাশীরাজ্য বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। কাশীর ব্রহ্মদত্তবংশীয় একজন অঙ্গাধিপতি হয়ত মগধও জয় করিয়াছিলেন কারণ বিধুরপণ্ডিতজাতকে রাজগৃহকে অঙ্গদেশের নগর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভট্টিয় নামক মগধের রাজার পুত্র বিম্বিসার ব্রহ্মদত্তবংশীয় অঙ্গ-রাজকে পরাজিত ও বধ করিয়া অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পানগরী অধিকার করিয়া সেখানে পিতার উপরাজা (Viceroy) রূপে বাস করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজগৃহে আসিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত-কাব্যে বিম্বিসারকে

হর্যংকবংশীয় বলা হইয়াছে। বিম্বিসার নামের অর্থ ঠিক জানা যায় না; কেহ বলেন তাঁর মাতা রানী বিম্বির নামানুসারে এই নাম হয়, কেহ বলেন তাঁর বর্ণ উৎকৃষ্ট সুবর্ণের মত ছিল, তাই তাঁহাকে বিম্বসার নাম দেওয়া হয়। তিনি শ্রেণীক বা শ্রেণ্য নামেও পরিচিত ছিলেন; এই নামেরও অর্থ স্পষ্ট নয়, কেহ বলিয়াছেন তিনি বহু সৈন্যের অধিপতি হওয়ায় ঐ নাম পাইয়াছিলেন। বৌদ্ধদের কাছে রাজগৃহ বিম্বিসারপুরী নামেও খ্যাত ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে অঙ্গদেশ জয় করার সময়ে বিম্বিসারের বয়স ১৬ বছর ছিল।

বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্বকালই রাজগৃহের চরমসমৃদ্ধির যুগ। বিম্বিসারের রাজত্বকালের প্রারম্ভে আধুনিক পাটনা জেলা ও আধুনিক গয়াজেলার উত্তরাংশ, এই ভূভাগ ছিল মগধের সীমা। এই সময়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ কাশীরাজ্য কোশলরাজ মহাকোশল কর্তৃক পরাভূত ও অধিকৃত হয় এবং অঙ্গরাজ্যও মগধের অঙ্গীভূত হয়। বুদ্ধিমান বিম্বিসার নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য অন্য ক্ষমতাশালী রাজাদের সঙ্গে মিত্রতা ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তিনি কোশলরাজকন্যা কোশলাদেবীকে বিবাহ করেন এবং এই বিবাহে কোশলরাজ কন্যার স্নানচূর্ণের (স্নানের সময়ে ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্যাদির) ব্যয় নির্বাহের জন্য কাশীগ্রামের রাজস্ব যৌতুকস্বরূপ দান করেন। গান্ধাররাজ পুক্কুসাতির সঙ্গে বিম্বিসারের পত্রব্যবহার ছিল এবং অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের পীড়ার সময়ে প্রদ্যোতের অনুরোধে বিম্বিসার নিজ চিকিৎসক জীবককে প্রদ্যোতের চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। পঞ্জাবের মদ্রদেশের রাজকন্যা ক্ষেমা, বৈশালীর লিচ্ছবি - রাজবংশীয়া এক কন্যা এবং বিদেহাধিপতির এক কন্যাকেও বিম্বিসার বিবাহ করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন পত্নীর গর্ভজাত বিম্বিসারের আটটি পুত্রের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে অজাতশত্রুই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। অজাতশত্রুর মাতা কে ছিলেন সে সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু সম্ভব কোশল-রাজকন্যাই তাঁর মাতা ছিলেন। বিম্বিসার রাজকার্যে সুনিপুণ ছিলেন। চুল্লবগ্‌গে উল্লিখিত আছে যে, তিনি মহামাত্র বা মন্ত্রীদের ও উচ্চ রাজকর্মচারীদের কাজে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন এবং যাহারা কার্যে সততা ও দক্ষতা দেখাইত তাহাদের পুরস্কার করিতেন এবং অসাধু ও অক্ষমদের পদচ্যুত করিতেন। রাজ্যের গ্রামিকদের (গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের) লইয়া তাঁর একটা বড় রাজসভার কথা মহাবগ্‌গে উল্লিখিত আছে।

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের বর্ণনায় দেখা যায় সে যুগে রাজগৃহ বহুতরু-পুষ্পশোভিত বহুঅট্টালিকা-প্রাসাদসমন্বিত বহুজনপূর্ণ অতি সমৃদ্ধ নগর ছিল। অনেক ধনবান শ্রেষ্ঠী প্রভৃতির তোরণযুক্ত প্রাচীরবেষ্টিত গৃহাদি ছিল। রাজগৃহ ব্যবসাবাণিজ্যের বড় কেন্দ্রস্থান ছিল। অনেক রাজগৃহবাসী বড় বড় ব্যবসায়ী বাণিজ্যোপলক্ষে সমুদ্রযাত্রা করিতেন এবং অনেক বিদেশী ব্যবসায়ীরা রাজগৃহে আসিতেন।

নগরে অনেক প্রকার উৎসব হইত এবং কোন কোন উৎসবে লোকে বহু মদ্যপান ও মাংসভোজন করিত এবং নানাবিধ নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান হইত। এইরূপ মেলা বা উৎসবকে 'সমাজ' বলা হইত। একবার কয়েকজন বিদেশী বণিক পণ্যক্রয় করিতে রাজগৃহে আসিয়া নগর উৎসবমত্ত থাকায় কেনাকাটা কিছুই করিতে পারে নাই। এরূপ একটি উৎসবের নাম পালিতে 'গিরগ্‌গ-সমজ্‌জ' বলা হইয়াছে; গিরগ্‌গ শব্দে টীকাকার 'যাহা পাহাড়ের উপর হয়, অথবা পাহাড়ের

উপর হইতে দেখিতে হয়' বুঝিয়াছেন, কিন্তু এখানে ইহাতে গিরিয়াক্ গ্রাম বুঝান হয়ত অসম্ভব নয়; এখনও কার্তিক-পূর্ণিমায় গিরিয়াক গ্রামে বড় মেলা বসে।

বৈদিকব্রাহ্মণ্যধর্ম - বিরোধী এবং অন্য নানাবিধ ধর্ম ও দর্শনসম্বন্ধীয় স্বাধীন মতবাদ প্রচারের প্রধানক্ষেত্রও সে যুগে ছিল রাজগৃহ। মহাসকুলদায়ি নামক একজন পরিব্রাজক একবার বুদ্ধকে বলিয়াছিলেন যে, মগধ ও অঙ্গদেশ বিবিধ - প্রকার ধর্মমতে পরিপূর্ণ। মজ্‌ঝিমনিকায় ও মহাবগ্‌গে উল্লিখিত আছে সম্বোধিলাভের পর বুদ্ধের মনে হইয়াছিল যে, মগধে প্রচলিত বিবিধ দূষিত ধর্মমত ও আচারের সংস্কার - সাধনই তাঁহার প্রথম কর্তব্য।

প্রাচীরবেষ্টিত রাজগৃহ নগরের চার দিকে নদী বা পরিখা ছিল। নগরের প্রবেশদ্বারগুলি সন্ধ্যার পর যখন বন্ধ করা হইত তখন কাহাকেও, এমনকি রাজাকেও নগরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। বিম্বিসার একবার 'তপোদা' সরোবরে স্নান করিয়া ফিরিবার সময়ে নগরদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া 'বেণুবনে' রাত্রি কাটাইয়াছিলেন। বুদ্ধ-ঘোষ প্রবেশদ্বারগুলির সংখ্যা ৬৪ ও রাজগৃহ-অধিবাসীদের সংখ্যা বহুকোটি বলিয়াছেন। ইহা অত্যুক্তি সন্দেহ নাই। নগরের উত্তর দ্বার হইতে যে রাস্তা বাহির হইয়াছিল তাহা নালন্দা পাটলিগ্রাম (এখানেই পরে পাটলিপুত্র নগর প্রতিষ্ঠিত হয়) এবং গঙ্গার অপরপারে বৈশালী প্রভৃতির দিকে গিয়াছিল। পূর্বদিকের চম্পানগরী প্রভৃতি স্থানে যাইতেও এই পথে রাজগৃহ হইতে বাহির হইতে হইত। রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যে খানুমত ও অম্বলট্‌ঠিকা (আম্রযষ্টিকা) নামে

গ্রাম ছিল, ইহাই ছিল রাজগৃহ হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম বিশ্রামস্থান। অম্বলট্ঠিকাতে বিম্বিসারের একটি 'আরাম' বা বাগানবাড়ি ছিল।

বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন রাজগৃহ 'অন্তোনগর' বা ভিতরের নগর এবং 'বহিনগর' বা বাহিরের নগর, এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। গিরিমালাবেষ্টিত নগর সম্বন্ধেই একথা বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন কিনা তা ঠিক বলা যায় না। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা মহাশয় বলেন যে, বুদ্ধঘোষ গিরিবেষ্টিত নগরকে 'অন্তোনগর' এবং তাহার বাহিরের শহরতলি অংশকে (যেমন উত্তরে বর্তমান New Fort অঞ্চল প্রভৃতি) 'বহিনগর' বলিয়াছেন। কিন্তু ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মনে করেন গিরিমালাবেষ্টিত নগরের দক্ষিণাংশে রাজপ্রাসাদাদি ছিল এবং উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশের মধ্যে প্রাচীর ছিল। সম্ভব দক্ষিণাংশের প্রাসাদ - সমন্বিত ভাগকে বুদ্ধঘোষ অন্তোনগর ও উত্তরাংশকে বহিনগর বলিয়াছেন।

প্রাচীন নগর সম্পর্কে হিউয়েন ৎসাংও কখন 'প্রাসাদনগর' কখনও বা 'গিরিনগরের' উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই দুই নগরকেই এক মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। ডক্টর মজুমদার দেখাইয়াছেন যে, হিউয়েন ৎসাং প্রাসাদনগর বলিতে গিরিবেষ্টিত প্রাচীন নগরের দক্ষিণাংশ এবং গিরিনগর বলিতে ইহার উত্তরাংশ বুঝিয়াছিলেন। হিউয়েন ৎসাং শুনিয়াছিলেন যে, গিরিমালাবেষ্টিত নগরের (এখন যাহাকে Old Fort বলা হয়) নাম ছিল গিরিব্রজ এবং তাহার বাহিরে উত্তরদিকের নগরকে (এখন যাহাকে New Fort বলা হয়) রাজগৃহ বলা হইত। ফা হিয়েনও 'নূতন নগর' ও

'পুরাতন নগরের' কথা বলিয়াছেন এবং তিনি শুনিয়াছিলেন যে, 'নূতন নগর' (New Fort) অজাতশত্রুকর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল কিন্তু হিউয়েন ৎসাং শুনিয়াছিলেন যে, কেহ বলেন ইহা বিম্বিসারনির্মিত, কেহ বলেন ইহা অজাতশত্রুনির্মিত।

ডক্টর লাহা বলেন 'নূতন' ও 'পুরাতন' নগর সম্বন্ধে এই যেসব জনশ্রুতি চীনা পরিব্রাজকরা শুনিয়াছিলেন তাহা ভ্রমপ্রসূত — পরবর্তী কালে পাটলিপুত্র প্রভৃতি স্থানে একাধিকবার রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় জনস্মৃতিতে এই ভ্রমের উৎপত্তি হয়, কারণ যেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত হইত রাজা সেখানে থাকিতেন বলিয়া তাহাই যেন 'নূতন' রাজগৃহ অর্থাৎ রাজধানী হইয়া দাঁড়াইত। ডক্টর লাহার মতে New Fort অঞ্চল প্রাচীন রাজগৃহের সমসাময়িক শহরতলি অঞ্চল ছিল; ইহার পশ্চিমাংশের পাথরের দেওয়ালঘেরা এলাকায় সম্ভব রাজপ্রাসাদাদি ছিল এবং পূর্বাংশে প্রাচীরবেষ্টিত সাধারণ লোকের বসতি ছিল (মানচিত্র ২)।

কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রে রাজগৃহের বর্ণনায় 'নূতন নগরের' অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং হিউয়েন ৎসাং যেসব কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় বিম্বিসারের রাজত্ব-কালের শেষদিকে অথবা অজাতশত্রুর সময়ে 'নূতন নগর' নির্মিত হয়। অগ্নিকাণ্ড বা মহামারীতে প্রাচীন নগর ছাড়িয়া হয়ত রাজা এখানে আবাস স্থাপন করিয়াছিলেন অথবা উত্তরদিক হইতে বৈশালীর লিচ্ছবিদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার প্রয়োজনে রাজা এখানে নূতন দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন।



রাজগীরের ডুলি

পৃ ২



সাতধারার এক প্রান্ত

পৃ ৬২

রাজগৃহের পাহাড়গুলি এখন যে নামে পরিচিত, যথা বিপুলগিরি রত্নগিরি ছঠাগিরি (অর্থাৎ ষষ্ঠগিরি) শৈলগিরি উদয়গিরি সোনাগিরি ও বৈভারগিরি (মানচিত্র ১), তাহা জৈনদের দেওয়া।

মহাভারতে এখানকার 'পাঁচ' পাহাড়ের নাম একবার বলা হইয়াছে বৈহার (ইহার বিশেষণরূপে 'বিপুলঃ শৈলঃ' কথা ব্যবহৃত হইয়াছে) বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও শুভচৈত্যক এবং আর একবার বলা হইয়াছে পাণ্ডর, বিপুল, বরাহক, চৈত্যক ও মাতঙ্গ।

বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাদের নাম পাণ্ডব, গিজ্ঝকুট (গৃধ্রকূট), বেভার (বৈভার), ইসিগিলি (ঋষিগিরি) ও বেপুল্ল (বিপুল)।

ডকৃটর লাহা সবিশেষ আলোচনা করিয়া সত্যই বলিয়াছেন যে, কিছু কিছু ঐক্য থাকিলেও এইসব বিভিন্ন নামে কাহারা কোন্ পাহাড় বুঝিতেন তাহা নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। বিভিন্ন যুগে পাহাড়গুলির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বলিয়াছেন হিউয়েন ৎসাং যে পাহাড়কে পি - পু - লো বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আধুনিক বৈভারগিরি কিন্তু ডকৃটর মজুমদার ঠিকই বলিয়াছেন যে, হিউয়েন ৎসাং ঐ নামে বিপুলগিরিকেই মনস্থ করিয়াছিলেন। বৈভারগিরিতে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে বৈভার বা বৈহার স্থলে 'ব্যবহারগিরি' নামও পাওয়া গিয়াছে।

এখন যে ছোট পাহাড়টিকে গৃধ্রকূট বলা হয়, ডকৃটর লাহার মতে বৌদ্ধরা সম্ভব তার চেয়ে অনেক বৃহত্তর গিরিভাগকে (অর্থাৎ শৈলগিরি ও উদয়গিরিকেও) ঐ নাম দিতেন। বৌদ্ধদের ইসিগিলি = খুব সম্ভব

আধুনিক সোনাগিরি। ডক্‌টর লাহার মতে বৌদ্ধদের পাণ্ডব = আধুনিক বিপুলগিরি, এবং বৌদ্ধদের বেপুল্ল = আধুনিক রত্নগিরি + ছঠাগিরি।

রাজগৃহের উষ্ণজল প্রস্রবণের উল্লেখ 'তপোদ' নামে মহাভারতে আছে। ব্রহ্মার তপস্থাপ্রসূত বলিয়া এই নামের উদ্ভব হয় এ ব্যাখ্যা বোধহয় ঠিক নয়। সম্ভব তপ্ত + উদ (বা উদক) হইতে এই নামের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে রাজগৃহের প্রধান জলস্রোতের নাম তপোদা; এই জল বাঁধিয়া একটি ছোট হ্রদ বা পুষ্করিণী প্রস্তুত হইয়াছিল, রাজা বিম্বিসার তাহাতে স্নান করিতেন। ইহার তীরে তপোদারাম নামে বিম্বিসারের একটি বাগান ছিল।

বুদ্ধ ও সঙ্ঘের জীবনসম্পর্কে বৌদ্ধশাস্ত্রে রাজগৃহের অনেক স্থানের উল্লেখ আছে কিন্তু কোন্ স্থানটি কোথায় ছিল তাহা সব সময়ে ঠিক বুঝা যায় না।

রাজগৃহে বুদ্ধ ও মহাবীর

ঐতিহাসিকরা বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ গয়ায় বোধিলাভ ও কাশীতে প্রথম ধর্মপ্রচার করিলেও তাঁহার শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল রাজগৃহ এবং এখান হইতেই তাঁহার শিক্ষা অন্য সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছিল। বুদ্ধ ও তাঁহার প্রধান শিষ্যদের জন্যই রাজগৃহ আজ জগদ্বিখ্যাত। জৈন ও আজীবিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যবৈদিকধর্ম-বিরোধী সম্প্রদায়েরও প্রধান প্রচারক্ষেত্র ছিল রাজগৃহ অঞ্চলে। রাজগৃহ ছিল সে যুগে স্বাধীন ধর্মদর্শনচিন্তার কেন্দ্রস্থল। বুদ্ধ গৃহত্যাগের পর কপিলবাস্তু হইতে মল্লরাজ্যস্থ (বর্তমান গোরখ্‌পুর জেলা) অনুপ্রিয় নামক স্থানে আসিয়া সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেন। জাতকে আছে তিনি অনুপ্রিয় হইতে সোজা রাজগৃহে আসেন এবং রাজগৃহ হইতে আলাড় কালাম ও উদ্রক রামপুত্র নামক গুরুদ্বয়ের কাছে শিক্ষালাভ করিতে যান। মহাবস্তুতে কিন্তু আছে তিনি বৈশালীতে আলাড় কালামের কাছে এবং তারপর রাজগৃহে উদ্রকের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ললিত-বিস্তরের কাহিনীও প্রায় মহাবস্তুর মত। কিন্তু এই বিষয়ে সবচেয়ে প্রামাণিক ও প্রাচীন উল্লেখ আছে দীঘনিকায়ের মহাসচ্চকসুত্তে ; ইহাতে বুদ্ধের নিজমুখে বলা হইয়াছে যে, তিনি আলাড় ও উদ্রকের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর মগধে আসেন।

রাজগৃহেই বুদ্ধ প্রথম ভিক্ষায় বাহির হন। প্রথম ভিক্ষায় প্রাপ্ত অন্ন তাঁহার কাছে এত কদর্য মনে হয় যে, তাহা খাইতে তাঁহার

বিবমিষার উদ্রেক হয়, কিন্তু "আমি সন্ন্যাসী, ভিক্ষাপ্রাপ্ত অন্নই আমাকে খাইতে হইবে" এই চিন্তা করিয়া তিনি নিজেকে ঐ অন্ন খাইতে বলপূর্বক বাধ্য করেন। বুদ্ধের ভিক্ষার নিয়ম ছিল এই, তিনি দিনে একবার মাত্র আহার করিতেন; পূর্বাহ্নে সম্বৃতবেশে ভিক্ষাপাত্রহস্তে বাহির হইয়া তিনি গৃহস্থের দ্বারে নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেন, একদ্বারে না পাইলে অন্য দ্বারে যাইতেন। ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষা পাইলেই তিনি আবাসস্থানে ফিরিয়া আসিতেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহা পাইতেন তাহাই খাইতেন, কিছু না পাইলে অনাহারে থাকিতেন। প্রথমবার রাজগৃহে আসিয়া তিনি পাণ্ডব পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

বুদ্ধের নিজমুখে বর্ণিত তপস্যা জীবনের কাহিনীতে উল্লেখ না থাকিলেও বৌদ্ধরা অন্যত্র বলিয়াছেন যে, একবার বুদ্ধ রাজগৃহ নগরে ভিক্ষায় বাহির হইলে বিম্বিসার প্রাসাদবাতায়ন হইতে পথে বুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহার সৌম্য ও অভিজাত মূর্তিতে আকৃষ্ট হন এবং লোক পাঠাইয়া তাঁহার বাসস্থানের খোঁজ নেন। এই ভিক্ষাটনের সময়ে নিশ্চয় বুদ্ধ নগরের দক্ষিণাংশের রাজপ্রাসাদ এলাকায় গিয়াছিলেন, নতুবা প্রাসাদবাতায়ন হইতে বিম্বিসার তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না। দক্ষিণাংশের প্রাসাদ এলাকা পাণ্ডবপাহাড় (অর্থাৎ আধুনিক বিপুলগিরি) হইতে অনেক দূর, বৌদ্ধশাস্ত্রের বর্ণনায়ও তাই দেখা যায় যে, রাজার প্রেরিত চরদিগকে বুদ্ধের পশ্চাদনুসরণ করিয়া নগর অতিক্রম করিয়া তাঁহার বাসস্থান পর্যন্ত আসিতে অনেক পথ হাঁটিতে হইয়াছিল।

বুদ্ধের সৌম্যমূর্তি অনেককেই আকৃষ্ট করিত। তিনি দীর্ঘদেহ, প্রশস্তবক্ষ ও গৌরবর্ণ ছিলেন এবং ধীর দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতেন। চরদের মুখে তাঁর বাসস্থানের খোঁজ পাইয়া বিম্বিসার পাণ্ডব পাহাড়ের গুহায় আসিয়া বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিম্বিসারের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ নিজের বংশপরিচয় দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে সত্যলাভ করিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তখনও লাভ করেন নাই। বিম্বিসার তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে, তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পর তিনি যেন আবার রাজগৃহে আসেন এবং বুদ্ধ ইহাতে সম্মত হন।

প্রথম রাজগৃহে আসিয়া স্থানটি ভাল লাগায় বুদ্ধ ভাবিয়াছিলেন "এইখানেই আমার বাসস্থান হইবে, এইখানেই আমি থাকিব", কিন্তু তাহা হয় নাই। রাজগৃহ হইতে তিনি উরুবেলে গিয়া কঠোর কৃচ্ছ সাধন আরম্ভ করেন এবং তাহাতে প্রায় মৃত্যুমুখে পৌঁছিয়াও অভীষ্ট সত্যলাভ না হওয়ায় কৃচ্ছ্র ত্যাগ করিয়া আহারাদি আরম্ভ করেন। বোধিলাভের পর তিনি বারাণসীর ঋষিপত্তন - মৃগোদ্যানে গিয়া ধর্ম প্রচারের পর আবার গয়ায় আসিয়া সেখান হইতে রাজগৃহে আসেন। ইতিমধ্যে কেহ কেহ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উরুবেলের কাশ্যপগোত্রীয় জটিল বা জটাধারী সম্প্রদায়ের কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভ্রাতা ছিলেন।

সশিষ্য বুদ্ধ রাজগৃহে আসিয়া নগরের প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণ - পশ্চিমে লট্‌ঠিবন (যষ্টিবন, আধুনিক জেঠিয়ান গ্রাম) নামক স্থানে বিম্বিসারের একটি তালবাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিম্বিসার

এখানে আসিয়া বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। সেকালের সব রাজাদের মত বিম্বিসারও সব সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের সম্মান করিতেন। জৈনরা বলিয়াছেন বিম্বিসার মহাবীরভক্ত ছিলেন কিন্তু সম্ভব বিম্বিসার বুদ্ধেরই বেশি পক্ষপাতী ছিলেন। রাজগৃহের সমুদায় অধিবাসি - পুরঃসর বিম্বিসারের মহা - সমারোহে বুদ্ধকে সম্বর্ধনার যে বর্ণনা বৌদ্ধরা করিয়াছেন, তাহা পরবর্তী কালের ভক্তকল্পনাপ্রসূত অতিরঞ্জন।

কিছুদিন পরে লোকজনের বুদ্ধের কাছে যাতায়াতের সুবিধা হইবে বলিয়া নগর হইতে বেশি দূরও নয়, নগরের জনকোলাহলের বেশি কাছেও নয় এমন একটি স্থান বুদ্ধের বাসের জন্য মনস্থ করিয়া বিম্বিসার বুদ্ধের হাতে স্বর্ণভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিয়া বুদ্ধ ও সঙ্ঘের ব্যবহারের জন্য নিজের "বেণুবন - আরাম" নামক উপবন দান করেন। বেণুবনের মধ্যে কলন্দক - নিবাপ নামক একটি সুন্দর পুষ্করিণী ছিল।

বুদ্ধ বর্ষাকালের চার মাস ছাড়া অন্য সময়ে স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া ধর্মপ্রচার করিতেন। যখন কোন স্থানে থাকিতেন তখনও এক জায়গায় বেশিদিন থাকিতেন না, কাছাকাছি নানা জায়গায় কখনও এখানে কখনও ওখানে বাস করিতেন। বেণুবন ছাড়া রাজগৃহের অন্য যেসব স্থানে তিনি থাকিতেন, তার মধ্যে গৃধ্রকূট ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। বিম্বিসার প্রায়ই গৃধ্রকূটে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাইতেন এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য পাহাড়ের গায়ে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাছাড়া সপ্তপর্ণী গুহা, শীতবন প্রভৃতি স্থানেও বুদ্ধ কখন কখন থাকিতেন। তাঁহার

প্রচারজীবনের প্রায় ৪০ বছরের মধ্যে বুদ্ধ বহুবার রাজগৃহে আসিয়া - ছিলেন।

গৃধ্রকূটে বাস করিবার সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে ঋষিগিরি, সর্পিণী নদীতীর (এখন রাজগৃহ - গিরিমালার পূর্বদিকে পঞ্চনা নামে যে নদী আছে, বুদ্ধের যুগে তাহাই সম্ভব গিরিমালার দক্ষিণে সর্পিণী নামে প্রবাহিত ছিল) প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। এইসব স্থানে এবং রাজগৃহের গিরিমালার উপরে ও চারদিকে সেযুগে নানা সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীদের অনেক আবাস ও সাধনাস্থান ছিল।

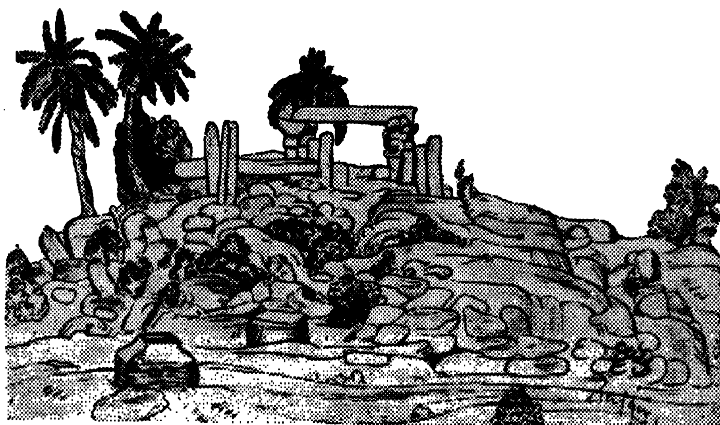
রাজগৃহের সব স্থানের মধ্যে গৃধ্রকূট ও বেণুবন, বিশেষত গৃধ্রকূট বৌদ্ধজগতের কাছে পরম পবিত্র তীর্থ। নানা বিদেশী বৌদ্ধরা এখানে ভক্তিপ্লুতচিত্তে সাষ্টাঙ্গপ্রণামাদি করেন। বুদ্ধের বহু উপদেশ, কথাবার্তা প্রভৃতির সঙ্গে গৃধ্রকূট ও বেণুবন ঘনিষ্ঠ জড়িত। বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে ধনিয় নামক একজন কুম্ভকারপুত্র গৃধ্রকূটের পাদদেশে একটি সুন্দর উপবন নির্মাণ করিয়াছিল, অনেক লোক তাহা দেখিতে আসিত।

যাঁহারা বুদ্ধের ধর্মপ্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, এমন শিষ্যদের মধ্যে অনেকে রাজগৃহ অঞ্চলের লোক ছিলেন এবং রাজগৃহেই বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন নালন্দার ব্রাহ্মণ বংশে জাত অতি মেধাবী ও চরিত্রবান লোক ছিলেন। বুদ্ধের শিক্ষা প্রচারে ইঁহারা বুদ্ধের দক্ষিণহস্ত - স্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা প্রথমে সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত (বৈরাটীপুত্র) নামক গুরুর শিষ্য ছিলেন। সঞ্জয় সংশয়বাদী অর্থাৎ প্রচলিত সব দার্শনিক মতের সত্যতায় সন্দিহান

ছিলেন। কথিত আছে যে, অশ্বজিৎ নামক বুদ্ধশিষ্যের কাছে বুদ্ধের কথা শুনিয়া সারিপুত্র বুদ্ধের শিক্ষায় আকৃষ্ট হন এবং বুদ্ধের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সারিপুত্রের কাছে শুনিয়া মৌদ্‌গল্যায়ন বুদ্ধের শিষ্য হন।

এই দুই মেধাবী পণ্ডিতের বুদ্ধশিষ্যত্ব গ্রহণে রাজগৃহের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় ও সাধারণ লোকের মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ভিক্ষুরা পথে বাহির হইলে লোকে একটা ছড়া বলিয়া তাহাদের ক্ষ্যাপাইতে আরম্ভ করে, "মহাশ্রমণ গিরিব্রজে আসিয়াছেন, তিনি সঞ্জয়ের সব শিষ্যদের ভাঙাইয়া লইয়াছেন; তারপর তিনি কাহাদের ভাঙাইবেন?" ভিক্ষুদের মুখে এই কথা শুনিয়া বুদ্ধও আর একটা ছড়া রচনা করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিতে ভিক্ষুদের শিখাইয়া দেন, "তথাগতরা সদ্ধর্মদ্বারা লোককে চালান, ইহাতে কে নিন্দা করিতে পারে?" ভিক্ষুরা এই ছড়া বলিতে আরম্ভ করিলে লোকে তাহাদের ক্ষ্যাপান বন্ধ করে। শাস্ত্রে এই ব্যাপারটি গুরুগম্ভীরভাবে বর্ণিত আছে, কিন্তু ইহাতে বুদ্ধের রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বুদ্ধনির্বাণের কিছু পূর্বে সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যু হয়। সারিপুত্রের মৃত্যু হয় তাঁর জন্মস্থান নালন্দায়। মৌদ্‌গল্যায়ন একবার যখন ঋষিগিরি পাহাড়ের গুহায় বাস করিতেছিলেন তখন বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকে গুণ্ডা লাগাইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে। বেণুবনের প্রবেশদ্বারের কাছে মৌদ্‌গল্যায়নের স্মৃতিতে স্তূপ রচিত হয়। ভক্তিভাজন লোকের ঐরূপ অপঘাতমৃত্যু বোধহয় অযশস্কর বিবেচনা করিয়া পরে বর্ণিত হয় যে, মৌদ্‌গল্যায়ন



বুদ্ধের আদি ধাতুস্তূপ

পৃ ৪০, ৫০



জরারাক্ষসীর মন্দির

পৃ ৬৬

এই আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া উঠেন এবং নালন্দাসন্নিকটে কোলিকগ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রাবস্তীর ধনবান শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ ব্যবসা উপলক্ষে রাজগৃহে বৈবাহিক গৃহে আসিয়া বুদ্ধের কথা শুনিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সঙ্ঘকে অনাথপিণ্ডদের বহু দানাদির কথা বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সারিপুত্র প্রভৃতির চেয়ে অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ যে মহাকাশ্যপ (ইনি উরুবেলের জটিল কাশ্যপ-ভ্রাতাদের হইতে ভিন্ন ব্যক্তি) পরে সঙ্ঘের অধিনায়ক হন এবং বুদ্ধনির্বাণের পর রাজগৃহে সম্মিলিত প্রথম ধর্মসঙ্গীতি (First Buddhist Council) যাঁহার সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়, সেই মহাকাশ্যপও রাজগৃহের ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন। তিনিও প্রথমে অন্য গুরুর শিষ্য ছিলেন। রাজগৃহ হইতে নালন্দার পথে বহুপুত্রকচৈত্য নামক একটি গাছতলায় বুদ্ধের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পিণ্ডোল ভারদ্বাজ নামক আর একজন অগ্রগণ্য বুদ্ধশিষ্য এবং সঙ্ঘের প্রধান বাগ্মী কুমার কাশ্যপও রাজগৃহের ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন।

রাজগৃহের বিখ্যাত চিকিৎসক জীবক বিম্বিসারের আদেশে একবার বুদ্ধের চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন। জীবক কোনও গণিকার গর্ভজাত ছিলেন; কেহ বলেন বিম্বিসার, কেহ বলেন বিম্বিসার-পুত্র রাজকুমার অভয় তাঁহার পিতা। জন্মের পর রাজপথে পরিত্যক্ত হইয়া তিনি রাজকুমার অভয় কর্তৃক প্রতিপালিত হন এবং এইজন্য তিনি কুমারভৃত্য নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসাদক্ষতার অনেক গল্প বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। বুদ্ধের একবার উদরশূল

রোগের চিকিৎসায় তাঁহার সুকুমারপ্রকৃতি বুঝিয়া জীবক নীলপদ্মের পাঁপড়িসহ ঔষধ তাঁহাকে খাইতে দেন। অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের চিকিৎসা করিয়া জীবক একখানি মহার্ঘবস্ত্র উপহার পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি বুদ্ধকে দান করেন এবং ইহাই বুদ্ধকে প্রথম বস্ত্রদান। জীবকের একটি বড় আমবাগান ছিল, তাহাও তিনি বুদ্ধ ও সঙ্ঘকে দান করেন। ইহা জীবকাম্রবন নামে খ্যাত; বুদ্ধ এখানেও মধ্যে মধ্যে থাকিতেন।

সঙ্ঘে নারীদের প্রবেশে বুদ্ধ অনুমতি দিলে বিম্বিসার - মহিষী ক্ষেমাপ্রমুখা রাজগৃহের অনেক ভদ্রমহিলা ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। ভিক্ষুণী মৈত্রিকা ও শুভা রাজগৃহের ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন; ভদ্রা কুণ্ডলকেশা থেরী (স্থবিরা) হইবার পর কিছুদিন গৃধ্রকূটে বাস করেন। সারিপুত্রের ভগিনী চালা উপচালা ও শিশু - উপচালাও ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু শেষোক্ত নামদ্বয় সম্ভব কাল্পনিক।

সঙ্ঘের ভেদও আরম্ভ হয় রাজগৃহে। বুদ্ধের জ্ঞাতিভ্রাতা ও শিষ্য দেবদত্ত বুদ্ধের "মধ্যপথ" অপেক্ষা কৃচ্ছ্রসাধনের বেশি পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভিক্ষুদের গৃহস্থগৃহে নিমন্ত্রণগ্রহণ, ভিক্ষাপ্রাপ্ত আমিষ ভোজন, বৃক্ষতল ছাড়া অন্যত্র বাস প্রভৃতির বিরোধী ছিলেন। এই সব বিষয় লইয়া বুদ্ধের সঙ্গে তাঁহার মতান্তর হয় এবং তিনি সঙ্ঘের নেতৃত্ব করিতে চাহিলে বুদ্ধ তাহাতে দৃঢ় অসম্মতি জানান। তখন দেবদত্ত সঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া ভিন্ন দল গঠন করেন।

সঙ্ঘ সংক্রান্ত আরও অনেক ঘটনা রাজগৃহে ঘটে; তাহা রাজগৃহ অপেক্ষা সঙ্ঘের ইতিহাসেই বেশি প্রয়োজনীয় বলিয়া এখানে

তাহার আলোচনা নিস্প্রয়োজন। বুদ্ধ একবার সব শিষ্যদের রাজগৃহে ডাকিয়া সঙ্ঘের হিতার্থক কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তন করেন। রাজগৃহ যে বুদ্ধের প্রিয়স্থান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দীঘনিকায়ে রাজগৃহের প্রায় প্রত্যেকটি স্থান সম্বন্ধে বুদ্ধের মুখে "রমণীয়" বলা হইয়াছে।

বিম্বিসারের জীবনকালে অজাতশত্রু অঙ্গরাজ্যের উপরাজা ছিলেন। বিম্বিসার বুদ্ধভক্ত ছিলেন বলিয়া বোধহয় পিতৃদ্বেষী অজাতশত্রু বুদ্ধবিরোধী ছিলেন এবং দেবদত্তও সম্ভব অজাতশত্রুকে এ বিষয়ে প্ররোচিত করেন। একবার বুদ্ধ ভিক্ষায় বাহির হইলে দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু মাতাল হাতি লাগাইয়া বুদ্ধকে বধ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বুদ্ধ মৈত্রীবলে হাতিকে বশ করিয়াছিলেন। আর একবার বুদ্ধ যখন গৃধ্রকূটশিখরে পদচারণা করিতেছিলেন তখন দেবদত্ত উপর হইতে পাথর গড়াইয়া ফেলিয়া তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সেই পাথর অন্য পাথরে আটকাইয়া ভাঙিয়া যায় এবং ভাঙা পাথরের টুকরায় বুদ্ধের আঘাত লাগায় ভিক্ষুরা বুদ্ধকে মঞ্চশিবিকায় (stretcher) করিয়া প্রথমে মদ্দকুচ্ছিতে ও পরে জীবকারামে লইয়া যান। "মদ্দকুচ্ছি" নামের উদ্ভব সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে গর্ভস্থ সন্তান পিতৃহন্তা হইবে জানিয়া অজাতশত্রুর মাতা এই উদ্যানে গিয়া কৃত্রিম উপায়ে 'কুক্ষিমর্দন' দ্বারা গর্ভপাত করাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ডক্টর লাহা মনে করেন মদ্দকুচ্ছি - শব্দ সংস্কৃত 'অদ্রিকুক্ষি' শব্দের অপভ্রংশজাত, অর্থাৎ যেস্থান পাহাড়ের পেটে (পাহাড়ঘেরা জায়গায়) অবস্থিত।

বিনয়পিটকে উল্লিখিত আছে অজাতশত্রু একবার তরবারি দ্বারা বিম্বিসারকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন এবং সামঞ্‌ঞফলসুত্তে বর্ণিত আছে অজাতশত্রু বাস্তবিকই বিম্বিসারকে হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু অজাতশত্রু বিম্বিসারকে কারারুদ্ধ করেন এবং রানী কোশলাদেবী বিম্বিসারকে আহার যোগাইবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও অজাতশত্রু বিম্বিসারকে অনাহারে মারিয়া ফেলেন একথাও বৌদ্ধরা বলিয়াছেন। বুদ্ধঘোষ সুমংগলবিলাসিনীতে বলিয়াছেন যে, মন্ত্রীদের মুখে পুত্রজন্মের সংবাদ পাইয়া অজাতশত্রু বাৎসল্যরসে পূর্ণ হইয়া বিম্বিসারকে কারামুক্ত করিবার ইচ্ছা করেন কিন্তু তদ্দণ্ডেই মন্ত্রীরা সংবাদ দেন যে অল্পক্ষণ আগে কারাগারে বিম্বিসারের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে অজাতশত্রু রোদন করিতে করিতে মাতার নিকট যান এবং মাতার মুখে বাল্যকালে অজাতশত্রুর প্রতি বিম্বিসারের বাৎসল্যস্নেহের কথা শুনিয়া অজাতশত্রু উষ্ণাশ্রু বিসর্জন করেন। মহাবংসে আছে যে, বুদ্ধনির্বাণের ৮ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ বুদ্ধের ৭২ বৎসর বয়সের সময়ে বিম্বিসারের মৃত্যু হয়। বিম্বিসারের বয়স বুদ্ধের চেয়ে ৫ বছর কম ছিল, অতএব মৃত্যুকালে বিম্বিসারের বয়স ৬৭ বছর হইয়াছিল।

রাজগৃহ জৈনদেরও অতি পবিত্র তীর্থ। জৈনপ্রসিদ্ধি অনুসারে ২৪জন জৈনতীর্থংকরদের প্রত্যেকেই রাজগৃহের বিভিন্ন পাহাড়ে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং ২০তম তীর্থংকর মুনিসুব্রতের রাজগৃহে জন্ম হয়। বিপুলগিরির শিরোদেশে মহাবীর প্রথম ধর্মপ্রচার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ৩২ বছর সন্ন্যাসজীবনের মধ্যে ১৪টি বর্ষা মহাবীর রাজগৃহ ও

নালন্দায় যাপন করেন। মহাবীরের ১১জন গণধর বা প্রধান শিষ্যের মৃত্যু হয় রাজগৃহের বিভিন্ন পাহাড়ে। রাজগৃহের রাজপরিবারের রানী রাজপুত্র প্রভৃতিদের এবং শ্রেষ্ঠী ও সাধারণ লোকের মধ্যেও অনেকে মহাবীরের ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন।

আজীবিক সম্প্রদায়ের গুরু গোশালও প্রায়ই রাজগৃহে থাকিতেন। আজীবিকরা নগ্ন থাকিতেন।

অজাতশত্রুর সময়ে রাজগৃহ

অজাতশত্রুর বুদ্ধবিদ্বেষ পরে কমিয়াছিল। দেবদত্তও সম্ভব ইতিমধ্যে মারা গিয়াছিলেন। সামঞ্ঞফলসুত্তে বর্ণিত আছে যে, পিতৃহত্যা-জনিত মানসিক অশান্তিতে অজাতশত্রু রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেন না এবং স্বপ্নে নানারূপ বিভীষিকা দেখিতেন। বিভীষিকা দেখিবার ভয়ে তিনি সারারাত জাগিয়া থাকিতেন। একবার কোন উৎসবোপলক্ষে নগর রাত্রে দীপমালাশোভিত হয় এবং জাগিয়া থাকিবার সুবিধা হইবে বলিয়া সপারিষদ অজাতশত্রু প্রাসাদের শিখর হইতে তাহা দেখিতে যান। ছাদে উঠিয়া বিমল চন্দ্রালোকে মুগ্ধ হইয়া তিনি পারিষদবর্গের সঙ্গে ঐরূপ বিমলজ্যোতি চরিত্রের সাধু ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আলাপ করিতে করিতে জীবকের মুখে বুদ্ধের প্রশংসা শুনিয়া অজাতশত্রু সম্ভব পরে কোন সময়ে জীবকাম্রবনে গিয়া বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে অজাতশত্রু সেই রাত্রেই বুদ্ধের কাছে গিয়াছিলেন, কিন্তু নির্জনবাসী সন্ন্যাসীর কাছে মধ্যরাত্রে রাজার সপারিষদ গমন সম্ভব নয়।

অজাতশত্রু বহু যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া মগধের শক্তি ও সীমা বাড়াইয়া-ছিলেন। বিম্বিসারের মৃত্যুর পর রানী কোশলাদেবীও পতিশোকে প্রাণত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে কোশলাদেবীর ভ্রাতা প্রসেনজিৎ পিতার মৃত্যুর পর কোশলের অধিপতি হন। পিতৃহন্তা অজাতশত্রু যে কোশলা-দেবীর বিবাহে যৌতুকস্বরূপে প্রদত্ত কাশীগ্রামের রাজস্ব কোশলাদেবীর

মৃত্যুর পরও ভোগ করিতেছিলেন, ইহা সহিতে না পারিয়া প্রসেনজিৎ কাশীগ্রাম অজাতশত্রুর নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ইহা লইয়া যুদ্ধ বাধে, কিন্তু শেষে উভয়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন হয় এবং অজাতশত্রুর সঙ্গে নিজকন্যা বজ্রার বিবাহ দিয়া প্রসেনজিৎ কন্যাকে কাশীগ্রাম পুনরায় যৌতুকস্বরূপে দান করেন।

বৈশালীর বৃজি - লিচ্ছবিরা অজাতশত্রুর চক্ষুশূল ছিল; তাহাদের একতা ও সংহতিই ছিল অজাতশত্রুর ক্রোধের কারণ। তিনি অঙ্গরাজ্যের উপরাজা থাকার সময়েই একটি খনি লইয়া লিচ্ছবিদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়। এখন মগধের অধীশ্বর হইয়া তিনি লিচ্ছবিদের ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হন এবং এবিষয়ে বুদ্ধের মতামত জানিবার জন্য একজন মন্ত্রীকে বুদ্ধের কাছে পাঠান। বুদ্ধ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, বৃজিরা যতদিন একতাবদ্ধ থাকিবে ততদিন তাহাদের কেহ জয় করিতে পারিবে না। তখন অজাতশত্রু পাটলিগ্রামে দুর্গ নির্মাণ করেন এবং চাতুরী ও ষড়যন্ত্র করিয়া বৃজিদের মধ্যে ভেদ ঘটান। এই যুদ্ধে কাশী কোশল মল্ল প্রভৃতি রাজ্যও লিচ্ছবিদের সঙ্গে যোগ দিয়া অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অজাতশত্রুর রাজ্যবিস্তারনীতিই অপর রাজ্যগুলিকে তাঁহার বিরুদ্ধে সংহতিবদ্ধ করে। এই যুদ্ধ ১৬ বছর ধরিয়া চলিয়াছিল এবং অবশেষে সকলকে পরাস্ত করিয়া অজাতশত্রু জয়লাভ করেন এবং কাশী কোশল বৈশালী প্রভৃতি রাজ্য স্বাধিকারভুক্ত করেন।

এদিকে কোশাম্বীরাজ্যও অবন্তীরাজ্যের অধিকারভুক্ত হওয়ায় মগধ ও অবন্তীরাজ্যের প্রত্যন্তসীমা পরস্পরকে স্পর্শ করে। অবন্তীরাজ "চণ্ড" প্রদ্যোতকে সকলেই ভয় করিত; তাঁহার আক্রমণের ভয়ে

অজাতশত্রু রাজগৃহ সুরক্ষিত করেন। কিন্তু অজাতশত্রুর জীবনকালে অবন্তীরাজ্যের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ বাধে নাই। অজাতশত্রু জৈনশাস্ত্রে "কূণিক" উপনামে পরিচিত, বোধহয় তাঁহার একটি হাত ভাঙা বা বাঁকা হওয়ায় তাঁহার এই নাম হয়।

বুদ্ধ তাঁহার জীবনের শেষ প্রচার-ভ্রমণে রাজগৃহ হইতেই যাত্রারম্ভ করেন। মল্লরাজ্যস্থ কুশীনগরে নির্বাণলাভের পর বুদ্ধের 'ধাতু' বা পূতাস্থির একাংশ অজাতশত্রু লাভ করেন। পেতবত্থু টীকা পরমত্থ - দীপানিতে আছে যে, অজাতশত্রু মহাসমারোহে 'ধাতু'র অভ্যর্থনা ও পূজাপ্রতিষ্ঠা করেন, রাজগৃহের চারদিকে ধাতুচৈত্য নির্মাণ করেন এবং ১৮টি মহাবিহারের জীর্ণসংস্কার করেন। এই বিবরণ নিশ্চয় ভ্রমাত্মক ; যাহা অজাতশত্রুর অনেক পরবর্তী কালে ঘটিয়াছিল তাহাকে টীকাকার অজাতশত্রু-সাময়িক অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু মহাকাশ্যপের অনুরোধে অজাতশত্রু 'ধাতু' ভূগর্ভে পুঁতিয়া তাহার উপর পাথরের স্তূপ নির্মাণ করেন, একথা হয়ত সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। যদি ইহা সত্য হয় তবে বুদ্ধধাতুর এই আদিস্তূপ ঐতিহাসিকদৃষ্টিতে মহামূল্যবান। কিন্তু এই স্তূপ ঠিক কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

বুদ্ধনির্বাণের পর প্রথম বর্ষায় প্রবীণ ভিক্ষুরা রাজগৃহে সম্মিলিত হইয়া বুদ্ধের উপদেশাবলী ও সঙ্ঘের নিয়মাদি সংগ্রহ করেন। ইহা ইতিহাসে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি (First Buddhist Council) নামে খ্যাত। স্থবির মহাকাশ্যপ এই সঙ্গীতিতে সভাপতিত্ব করেন। বিনয়পিটকে আছে যে, এই সঙ্গীতিতে "পাঁচশত" ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। বৌদ্ধ -



বেণুবনে আধুনিক রাস্তার পাশে ধুনাবট

পৃ ৫০



"নূতন" রাজগৃহের উত্তরদিক

পৃ ৪৬

শাস্ত্রে ৫ জন, ৫ শত, ৫ সহস্র প্রভৃতি সংখ্যা আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া ক্রমান্বয়ে কয়েকজন, অনেক ও বহুসংখ্যক প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হইত। এই সঙ্গীতিতে সম্ভব ২।৩ শতের বেশি ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন না। রাজগৃহে এই সঙ্গীতির অধিবেশনের কারণ বিনয়পিটকে বলা হইয়াছে যে, রাজগৃহে "৫ শত" ভিক্ষুর বাসস্থান পাওয়ার স্থবিধা ছিল।

এই সঙ্গীতির অধিবেশন সপ্তপর্ণী গুহার সামনে হইয়াছিল। বৌদ্ধ-সাহিত্যে কোথাও কোথাও সপ্তপর্ণী গুহার অবস্থিতি গৃধ্রকূটাদি বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট হইলেও অধিকাংশমতে ইহা ছিল বৈভারগিরির উত্তরগাত্রে। পরমত্থদীপানিতে আছে যে, অজাতশত্রু এই সঙ্গীতির জন্য একটি মণ্ডপ (অস্থায়ী আবাস) নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সঙ্গীতির অধিবেশন গুহায় হইয়াছিল না মণ্ডপে হইয়াছিল, মণ্ডপটি গুহার সাম্‌নে না কাছে না অন্য কোথাও ছিল, এসম্বন্ধে আধুনিক আলোচকদের মধ্যে মতবিভেদ আছে। আমরা একথা পরে বিবেচনা করিব।

পরবর্তী যুগের রাজগৃহ

অজাতশত্রু সম্ভব ৩২ বছর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র উদায়ি বা উদায়িভদ্র মগধের রাজা হন। নিজ রাজত্বের ৪র্থ বৎসরে (বুদ্ধনির্বাণের ২৮ বছর পরে) উদায়ি পাটলিপুত্র বা কুসুম - পুরে নগর নির্মাণ করিয়া সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ; সম্ভব অগ্নিদাহে রাজগৃহ বিনষ্ট হওয়াই ইহার কারণ। বিমানবত্থুটীকায় আছে যে রাজগৃহে প্রায়ই অহিবাত রোগের (প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর) প্রাদুর্ভাব হইত ; ইহা নগরত্যাগের এমনকি ব্যাধিনাশের জন্য ইচ্ছাকৃত অগ্নিদাহেরও কারণ হইতে পারে।

উদায়ি ও তাঁহার পরবর্তী তিনজন বংশধরও সম্ভব পিতৃহন্তা ছিলেন। প্রজারা ইহাতে উত্তেজিত হইয়া কাশীর উপরাজা — কাশী তখন মগধের অধীনে — শিশুনাগকে মগধের সিংহাসনে বসায়। শিশুনাগ অবন্তীরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং রাজধানী রাজগৃহে ফিরাইয়া আনেন, কিন্তু পরে তাহা আবার বৈশালীতে স্থানান্তরিত করেন। শিশুনাগের পরবর্তী রাজা কাকবর্ণ (বা কালাশোক) আবার পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং তদবধি পাটলিপুত্রই মগধের রাজধানী থাকিয়া যায়। মালালংকারবত্থুতে বলা হইয়াছে যে, শিশুনাগের সময় হইতেই রাজগৃহের রাজধানী - গৌরব অন্তর্হিত হয়। শিশুনাগের পরে মগধের ইতিহাসের সঙ্গে রাজগৃহের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, তাই আমরা তাহার আলোচনায় বিরত থাকিব। অতঃপর

ইতিহাস ও সাহিত্যে রাজগৃহ বিস্মৃতি - যবনিকার অন্তরালে প্রায় অদৃশ্য হয়।

জৈনশাস্ত্রে খৃ. পূ. ৩ শতকে রাজগৃহে দারুণ দুর্ভিক্ষের উল্লেখ আছে। সম্রাট অশোক (অনুমান খৃ. পূ. ২৭৩-২৩২) বৌদ্ধতীর্থাদি ভ্রমণের সময়ে নিশ্চয় রাজগৃহেও আসিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বৌদ্ধতীর্থের মত এখানেও স্তম্ভস্তূপাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। "নূতন" নগরের (New Fort) কিছু পশ্চিমে হিউয়েন ৎসাং অশোকনির্মিত একটি স্তূপ ও লিপিসমন্বিত ৫০ ফুটেরও বেশি উঁচু একটি পাথরের অশোকস্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। ফা হিয়েন ও হিউয়েন ৎসাং রাজগৃহের যেসব স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সম্ভব অশোকনির্মিত ছিল; পেতবত্থুটীকাকার যে ধাতুচৈত্য - নির্মাণ, বিহারসংস্কার ও পূজাপ্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন, সেসব খুব সম্ভব অশোকযুগের কীর্তির স্মৃতিপ্রসূত। হিউয়েন ৎসাঙের বিবরণ হইতে মনে হয় যে, অজাতশত্রু - স্থাপিত স্তূপে ভূগর্ভলুক্কায়িত বুদ্ধধাতুর কথা লোকে বিস্মৃত হইয়াছিল এবং অশোক তাহা আবিষ্কার করিয়া ধাতুর একাংশ আদিস্তূপে রাখিয়া বাকি ধাতু তাঁহার দ্বারা সমগ্র ভারতের অন্যত্র নির্মিত বহুসংখ্যক স্তূপে স্থাপন করিয়াছিলেন, এই মর্মের কিম্বদন্তী হিউয়েন ৎসাং শুনিয়াছিলেন।

কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি (অনুমান খৃ. পূ. ২ শতকে) মগধ আক্রমণ করিয়া গোরথগিরিতে আসেন এবং সেখান হইতে রাজগৃহ অবরোধ করেন। রাজধানী রাজগৃহে না থাকিলেও তদানীন্তন মগধরাজ (বৃহস্পতিমিত্র ?) সম্ভব পাটলিপুত্র ছাড়িয়া রাজগৃহে আশ্রয়গ্রহণ করায় খারবেল রাজগৃহ

অবরোধ করেন। অনুমান খৃ পূ. ২ শতকে স্থবির ইন্দ্রগুপ্ত নামক ভিক্ষু রাজগৃহ-অঞ্চলের প্রতিনিধিরূপে সিংহলে একটি স্তূপস্থাপন উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ইহার প্রায় ৭ শত বৎসর পরে ফা হিয়েনের ভ্রমণবৃত্তান্তে আবার রাজগৃহের কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। এই সময়ে রাজগৃহের প্রাচীন স্তূপাদি বিনষ্ট না হইলেও নগর জনহীন জঙ্গলময় অবস্থায় ছিল। ৭ শতকে হিউয়েন ৎসাং নালন্দা উদ্দণ্ডপুর প্রভৃতি নিকটবর্তী স্থান সমৃদ্ধ অবস্থায় দেখিলেও রাজগৃহকে প্রায় পরিত্যক্ত দেখেন। বিপুলগিরিতে কৃচ্ছ্রসাধনরত নগ্ন জৈন শ্রমণদের এবং রাজগৃহে (অর্থাৎ "নূতন" শহরে) প্রায় হাজার ঘর ব্রাহ্মণ পরিবার তিনি দেখিয়াছিলেন। ৭ শতকের প্রারম্ভে বাংলার রাজা বৌদ্ধদ্রোহী সমূল-বোধিদ্রুমোৎপাটক শশাঙ্ক সম্ভব রাজগৃহের স্তূপচৈত্যাদি অনেক ভাঙিয়া ফেলিয়াছিলেন। ৮-১২ শতকে গৌড়ের পালবংশীয় রাজারা উদ্দণ্ডপুর ও পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করিয়া যখন নালন্দা উদ্দণ্ডপুর বিক্রমশিলা প্রভৃতি স্থানে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন তখন তাঁহারা যে রাজগৃহকে বিস্মৃত হন নাই তাহা প্রমাণিত হয় রাজগৃহে আবিষ্কৃত পালযুগের মূর্তি প্রভৃতি হইতে। অবশেষে ১২ শতকের শেষ ও ১৩ শতকের প্রারম্ভে কুতবুদ্দিনের সেনাপতি বখ্তিয়ারপুত্র মহম্মদ যখন নালন্দা উদ্দণ্ডপুর ও বিক্রমশিলা নিঃশেষে ধ্বংস করেন তখন সম্ভব রাজগৃহেরও তিনি বহু ক্ষতিসাধন করেন। মুসলমান রাজত্বকালে রাজগৃহের বহু প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্তূপচৈত্যাদি কবরখানায় পরিণত করা হইয়াছিল, আজও তাহার চিহ্ন সর্বত্র বর্তমান।

সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগ রাজগৃহে এপর্যন্ত যে খননাদি করিয়াছেন তাহা অতি সামান্য মাত্র। এরূপ ঐতিহাসিক স্থান পাশ্চাত্যদেশে হইলে যেরূপ যত্ন ও অর্থব্যয়ে বিস্তৃতভাবে খনিত ও পরিরক্ষিত হইত তাহার এক আনা অংশও রাজগৃহে হয় নাই।

বর্তমান - রাজগৃহ পরিক্রমা

সাধারণত শীতকালেই রাজগৃহে দর্শকদের সমাগম হয়। শীতকালের বৈকাল ছোট হয়; যতদিন রাস্তা ও যানাদির ভাল ব্যবস্থা না হয় ততদিন হাঁটিয়াই দর্শককে রাজগৃহ দেখিতে হইবে, তাই দূরের জায়গাগুলি সকালে দেখার কথা নীচে বলিয়াছি। যাত্রীরা বেশির ভাগ দুপুরবেলায় বা বৈকালে রাজগীরে পৌছেন, তাই সেদিন বৈকাল হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়াছি।

১ম দিন বৈকাল

"নূতন" নগরের লোকালয়

পাঠক এই অধ্যায়ের অংশগুলি পড়িবার সময়ে মানচিত্র দুইটির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবেন। আমরা রেল ষ্টেশন হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিব। পূর্বে যে "নূতন" রাজগৃহ, "নূতন" নগর বা New Fort - এর কথা বলিয়াছি তাহারই মাঝখানে বর্তমানের রেল ষ্টেশন অবস্থিত। এই "নূতন" রাজগৃহের দুইটি অংশ ছিল — ১. বড় বড় পাথরে তৈয়ারি দেওয়াল ঘেরা এলাকায় রাজপ্রাসাদাদি ছিল, ইহা ষ্টেশনের দক্ষিণ - পশ্চিমে এবং ২. মাটির দেওয়াল ঘেরা সাধারণ লোকের বাসস্থান এলাকা; ষ্টেশনের দক্ষিণে, পূর্বে ও উত্তরে কিছুদূর গেলেই এই মাটির দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ষ্টেশন হইতে রেললাইন ধরিয়া

উত্তরদিকে অল্পদূর অগ্রসর হইলে দ্বিতীয় যে রাস্তাটি পূর্ব - পশ্চিমে দেখা যায় তাহাতে পশ্চিমে সামান্য দূর গেলে বাজারের মাঝখানে পৌছান যায়। এই রাস্তাটিই পূর্বদিকে ৭ মাইল দূরে গিরিয়াক পর্যন্ত গিয়াছে। গিরিয়াকে অনেক বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ আছে। "নূতন" রাজগৃহের মাটির দেওয়াল ঘেরা এলাকায় এবং আধুনিক বাজারের চার পাশের পাড়াগুলিতে প্রাচীন বাড়িঘরের ভিত্তি অনেক চোখে পড়ে। ৺পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের বাড়ির বাগানে রাজগৃহের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত অনেক প্রস্তরমূর্তি সংরক্ষিত আছে।

২য় দিন সকাল

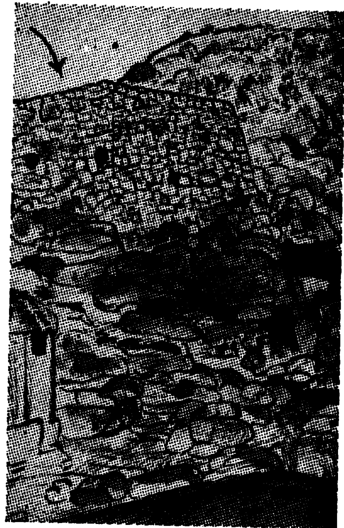
"নূতন" নগরের প্রাসাদ - অংশ

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়াই দক্ষিণ - পশ্চিমে "নূতন" রাজগৃহের পাথরবাঁধান রাজপ্রাসাদ এলাকার দেওয়াল দেখা যায়। এই দেওয়ালের পশ্চিম দিক মাটির, বাকি তিন দিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর বিনা চুণ - শুরকিতে উপর উপর সাজাইয়া নির্মিত। এইরূপ বৃহদাকার পাথরের চুণশুরকিহীন গাঁথনিকে পুরাতাত্ত্বিকরা Cyclopean (অর্থাৎ যেন দৈত্য দানব - নির্মিত, মনুষ্য - নির্মিত নয়) বলেন। এই দেওয়ালের চারদিকে চারটি দ্বার ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও দেখা যায়। উত্তর - দেওয়ালের বাহিরে একটা মাটির দুর্গ ভাঙা অবস্থায় দেখা যায়। দক্ষিণ দেওয়ালের উপরে ও পাশে অনেক ইঁটের গাঁথনির চিহ্ন আছে। এই এলাকার ভিতরের বাড়িঘর নিশ্চিহ্ন হইয়াছে কিন্তু খননের ফলে বাড়ি -

ঘরের ৩।৪টি স্তর পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সব প্রাচীনস্থানেই যেখানে ঘন লোকবসতি বা প্রসিদ্ধ মন্দিরাদি গৃহ ছিল সেখানে খনন করিলে যুগপরম্পরায় লোকবসতি ও গৃহাদি পুনঃপুন নির্মাণের বিভিন্ন স্তর একটির নীচে একটি দেখিতে পাওয়া যায়। রাজগৃহ - নালন্দায় সামান্য যেটুকু খনন হইয়াছে তাহা পালযুগ (খৃ. ৮ - ১২ শতক), বড় জোর কোথাও গুপ্তযুগের (খৃ. ৫ - ৭ শতক) স্তর পর্যন্ত মাত্র পৌঁছিয়াছে। গুপ্তযুগের স্তরের ৫।৭ হাত নীচে আছে মৌর্যযুগের (খৃ. পূ. ৪ - ২ শতক) স্তর, তারও নীচে আছে বুদ্ধযুগের স্তর। বুদ্ধযুগের স্তরের অনেক নীচে ক্রমান্বয়ে আছে প্রাগার্য, প্রাগৈতিহাসিক প্রভৃতি যুগের স্তর।

শীতবন, অশোকস্তূপ ও সর্পশৌণ্ডিক - প্রাগ্‌ভার

"নূতন" নগরের পশ্চিমে একটি খাল, বোধহয় পূর্বে ইহা নদীর মত ছিল, এখন ইহাকে বৈতরণী বলা হয়। ইহার তীরে প্রাচীন শ্মশানের চিহ্ন আছে, বোধহয় বুদ্ধের যুগের শীতবন শ্মশান এই অঞ্চলেই ছিল এবং এখান হইতে দক্ষিণের অনেকখানি পর্যন্ত স্থানকেই শীতবন বলা হইত। বৈতরণীর পশ্চিম পাড়ের উঁচু ঢিবিটি অশোকনির্মিত ধাতু - স্তূপের অবশেষ, ইহার অব্যবহিত পশ্চিমে একটি প্রকাণ্ড বিহারেরও চিহ্ন আছে। হিউয়েন ৎসাং যে অশোকস্তম্ভ দেখিয়াছিলেন তাহাও নিশ্চয় কাছাকাছি ছিল। কেহ কেহ অন্যত্র অশোকস্তূপের স্থান কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু তাহা সঙ্গত মনে হয় না। এই অঞ্চল হইতে নালন্দা পর্যন্ত উন্মুক্ত ভূভাগ হইতে বৈভারগিরির উত্তর গাত্র



জরাসন্ধকী বৈঠক　　পৃ ৫৮



জৈন মন্দির　　পৃ ৫৪

সর্পফণাশ্রেণীর মত দেখায়, ইহাকেই বোধহয় বৌদ্ধরা সপ্পসোণ্ডিয় পব্ভার (সর্পশৌণ্ডিক - প্রাগ্ভার ; শুণ্ড = ফণা, প্রাগ্ভার = গিরিপার্শ্ব) বলিতেন এবং সম্ভব এই পর্যন্ত শীতবনের সীমানা মনে করা হইত। সেইজন্যই বোধহয় সর্পশৌণ্ডিক - প্রাগ্ভার শীতবনের মধ্যে বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রাচীন রাজপথের উভয় পার্শ্ব — বর্মীমন্দির, জাপানীমন্দির, গোরক্ষিণী ধর্মশালা, ইন্স্পেক্শন বাংলো, রেষ্ট হাউস

"নূতন" নগরের পাথরের দেওয়ালের দক্ষিণসীমার ঠিক পূর্বদিকে যে ঢিবিটির উপর এখন বর্মীমন্দির, তাহা ছিল "নূতন" নগরের মাটির দেওয়ালের একটি প্রান্ত। এখনকার রাস্তা যেখান দিয়া দেওয়াল ছাড়িয়া দক্ষিণে গিয়াছে সেখানে একটি দ্বার ছিল। বর্তমান রাস্তার কিছু বাঁয়ে (পূর্বদিকে) নিচু জায়গায় বিম্বিসার যুগের রাজপথের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। মাটির দেওয়ালের মধ্যের এলাকায়ও এই রাজপথের চিহ্ন অনেক স্থানে আছে। মাটির দেওয়াল (অর্থাৎ বর্মী মন্দিরের ঢিবি) হইতে দক্ষিণদিকে জাপানী মন্দিরের গেটের সাম্নে দিয়া প্রাচীন রাজপথ গিরিপ্রাকারের উত্তরদ্বার পর্যন্ত গিয়াছিল। এই রাজপথের দুই পাশের উঁচু জায়গা ও ঢিবিগুলি সব প্রাচীন বাড়িঘর স্তূপচৈত্য - বিহারাদির অবশেষ। পূর্বদিকে প্রায় বিপুলগিরির তলদেশ পর্যন্ত এই অঞ্চল বাড়িঘরে আচ্ছন্ন ছিল। জাপানী মন্দিরের উত্তর - পূর্বে একটি পাথরবাঁধান প্রকাণ্ড পুষ্করিণী ছিল, এখনকার মখদুম - কুণ্ডের জল আসিয়া এই পুষ্করিণীতে পড়িত, সে পয়ঃপ্রণালী এখনও দেখা যায়। বর্তমান

রাস্তা হইতে ইন্‌স্পেক্‌শন বাংলোয় যাইবার মোড়ে গোরক্ষিণী সভার ধর্মশালা যেখানে, সেখানেও বোধহয় কোন প্রাচীন বিহারাদি ছিল।

বুদ্ধের ধাতুস্তূপ—বেণুবন ও কলন্দক - নিবাপ

জাপানীমন্দিরের প্রায় সাম্‌নে, বর্তমান রাস্তার পূর্বধারে যে উঁচু ও বড়পাথরে বাঁধান ভিত্তিটি আছে, তাহাই সম্ভব ছিল অজাতশত্রু নির্মিত বুদ্ধধাতুর স্তূপ। ইহার পশ্চিম - দক্ষিণের প্রায় সমগ্র এলাকাই সম্ভব ছিল বেণুবন। এই এলাকার মধ্য দিয়া উত্তরদক্ষিণ - বিস্তারী যে খালটি দেখা যায় তাহা আধুনিক, বিগত ৮০ বছরের মধ্যে কাটা। এই খালের গায়ে স্থানে স্থানে প্রাচীন ভিত্তির বড় বড় পাথর দেখা যায়। খালের পশ্চিমে যে গভীর বড় পুষ্করিণীটি, তাহাই সম্ভব ছিল কলন্দক - নিবাপ। বাঁশবনে ঘেরা ছিল বলিয়া রাজা বিম্বিসারের এই বাগানবাড়ির নাম বেণুবন হইয়াছিল। পালিতে কলন্দ বা কলন্দক = কাঠবিড়ালি বা শালিখ পাখি; সংস্কৃত করণ্ড (বা করণ্ডক = বাঁশের চুপ্‌ড়ি, ছোট বাক্‌স) শব্দের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। নিবাপ মানে পশুপাখির বিচরণ ও জলপানের স্থান। আধুনিক পণ্ডিতেরা কেহ কেহ রাজগীরের অন্যত্র কয়েক স্থানে বেণুবন, কলন্দক - নিবাপ, অজাতশত্রু - নির্মিত ধাতুস্তূপ প্রভৃতির স্থাননির্দেশ - সম্ভাবনা অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে বৌদ্ধগ্রন্থ ও চীনা বর্ণনার সঙ্গে অনেক অসঙ্গতি হয়।

ফা হিয়েন বলিয়াছেন বেণুবন প্রাচীন রাজপথের পশ্চিমে ছিল এবং পূর্বদিকে ইহার প্রবেশপথ ছিল। দক্ষিণে বেণুবনের সীমা এখনকার

দোকানঘরগুলি পর্যন্ত সম্ভব পৌঁছিত। উত্তরে ইহার সীমা ছিল প্রায় রেষ্ট হাউস ও ইন্‌স্পেক্‌শন বাংলোর কম্পাউণ্ড পর্যন্ত। সমন্ত-পাসাদিকায় বর্ণিত আছে যে, বেণুবন প্রাচীর - বেষ্টিত ছিল এবং প্রাচীরের গায়ে গোপুর - অট্টালিকাদি (নহবৎখানার মত gate-house) ছিল। এই দেওয়ালের চিহ্ন ও চারকোণের চারটি ঢিবি অভিজ্ঞদৃষ্টিতে বোধহয় এখনও ধরা পড়ে। এই বাগানবাড়ির সবচেয়ে বড় বাড়িটি বিহারে পরিণত হইয়াছিল, সম্ভব ইহা পুষ্করিণীর দক্ষিণে ছিল। সমগ্র বেণুবনে পরবর্তী যুগে আরও অনেক বিহার - স্তূপাদি নির্মিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই কারণ বৌদ্ধদের চক্ষে ইহা ছিল পরম পুণ্যক্ষেত্র। এখনও ইহার সর্বত্র বাড়িঘর দেওয়াল প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ প্রোথিত দেখা যায়। সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যুর পর বেণুবনে তাঁহাদের ধাতুস্তূপ নির্মিত হইয়াছিল।

বেণুবনের যে পুষ্করিণীটিকে কলন্দক - নিবাপ বলিয়াছি তাহা দেখিতে খুব প্রাচীন নয়। বোধহয় পবিত্রতাবশত একাধিকবার ইহার পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছিল, তাই নূতনের মত দেখায়।

জাপানীমন্দিরের সাম্‌নের যে ভিত্তিটিকে আমরা বুদ্ধের ধাতুস্তূপ অনুমান করিয়াছি তাহা প্রাচীন বর্ণনার সঙ্গে মিলে। হিউয়েন ৎসাং বলিয়াছেন ইহা বেণুবনের পূর্বদিকে ছিল এবং বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন ইহা নগরের (অর্থাৎ "নূতন" নগর বা New Fort - এর, কারণ বুদ্ধঘোষের সময়ে গিরিমালার মধ্যবর্তী প্রাচীন নগর জনহীন জঙ্গলময় ছিল কিন্তু "নূতন" রাজগৃহে লোকবসতি ছিল) পূর্ব - দক্ষিণে ছিল। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে বর্ণিত আছে এই স্তূপ বেণুবনের মধ্যে ছিল;

ইহাতে মনে হয় বেণুবনের পূর্বসীমা প্রাচীন রাজপথ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, ভারত - পুরাতত্ত্ববিৎ সার জন মার্শালের মতে অশোকের যুগের আগে যেসব স্তূপ নির্মিত হইত তাহা আকারে খুব ছোট হইত। সাঁচী সারনাথ প্রভৃতি স্থানের মত বৃহদাকার স্তূপ *নির্মাণ অশোকই প্রথম আরম্ভ করেন। সারিপুত্র মৌদ্‌গল্যায়ন* এমনকি বুদ্ধেরও প্রথম ধাতুস্তূপ বোধহয় বেণুবনের মধ্যে ছোট ছোট ঢিবির মত ছিল। বুদ্ধঘোষ যেসব কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় বুদ্ধের ধাতুস্তূপ মগধ কোশল প্রভৃতি যেখানে যেখানে ছিল সেখানে অনেক স্থানে স্তূপ হইতে 'ধাতু' অর্থাৎ পূতাস্থি চুরি হইয়া গিয়াছিল। রাজগৃহের ধাতু যাহাতে চুরি না হইতে পারে সেজন্য স্থবির মহাকাশ্যপ অজাতশত্রুকে পাথরের সুদৃঢ় স্তূপ নির্মাণ করিয়া তাহাতে মাটির তলায় ধাতু রক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই স্তূপ কালবশে নষ্ট হইলে ইহার পবিত্রতাবশত ইহারই উপর, সম্ভব বৌদ্ধ রাজারা যুগে যুগে পুনরায় স্তূপচৈত্যাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

হিউয়েন ৎসাং বলিয়াছেন এই বুদ্ধস্তূপের কাছে — কোন্ পাশে বা সামনে না পিছনে তাহা বলেন নাই — আনন্দের ধাতুস্তূপ ছিল। জাপানী মন্দিরের দেওয়ালের মধ্যে একটি স্তূপের ভিত্তি আছে। এই অঞ্চলে জাপানীমন্দিরের চারপাশের এলাকায় অনেক স্তূপের ভিত্তি পাওয়া যায়, তার মধ্যে জাপানী মন্দিরের দেওয়ালের মধ্যেব স্তূপভিত্তিটিই বুদ্ধধাতুস্তূপের পর বৃহত্তম।

বর্তমান রাস্তার দুই পাশে, বুদ্ধধাতুস্তূপের উপর, বেণুবনের অন্যান্য টিবি বা স্তূপাদির উপর, জাপানী মন্দিরের চারদিকে ও "জরাসন্ধকী বৈঠকের" উপর যেসব কবর দেখা যায় তাহা মুসলমান যুগের দুষ্কৃতি। ইহারা ভাঙিয়া চুরিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, যেখানে উঁচু বা ভাল বাঁধান জায়গা পাইয়াছে সেখানেই কবরখানা তৈয়ারি করিয়াছে। অনেক কবর দরগা প্রভৃতি যে প্রাচীন স্তূপাদির ইঁট পাথর দিয়া তৈয়ারি হইয়াছিল তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। ব্যবসায়ী কণ্ট্রাক্টার ও সাধারণ লোকেও প্রাচীন বাড়িঘরের ইঁটপাথর ভাঙিয়া রাস্তা বাড়ি প্রভৃতি নির্মাণের মশলা সংগ্রহ করিয়াছে, ইহা সব প্রাচীন স্থানেই হইয়া থাকে দেখা যায়।

বেণুবনের এলাকায় যেসব ভাঙা মাটির ঘরের দেওয়াল দেখা যায় সেগুলি মেলার সময়কার দোকানপাটের অবশেষ। প্রতি চার বছর অন্তর মলমাসে রাজগীরে একমাসব্যাপী বৃহৎ মেলা বসে। লক্ষ লক্ষ লোক এই মেলা দেখিতে আসে। শোন্‌পুরের হরিহরছত্রের মেলার পর রাজগীরের এই মেলাই বিহারের সর্বপ্রধান মেলা। ১৯৫০ সালে এই মেলা হইয়া গিয়াছে। রাজগীরের সর্বত্র যেসব সিমেণ্টবাঁধান কূপ দেখা যায় সেগুলি এই মেলার জলসরবরাহের জন্য খনিত, কিন্তু কয়েকস্থানে ইঁটের প্রাচীন কূপও কতকগুলি দেখা যায়।

বিপুলগিরির তলদেশ — মখ্‌দূমকুণ্ড ও সূর্যকুণ্ড

জাপানী মন্দিরের পূর্ব - দক্ষিণে মখ্‌দূমকুণ্ড ও মসজিদ প্রভৃতি। মখ্‌দুম শা নামক বিহারের একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধু এখানকার

গুহায় বাস করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডের জল প্রায় শীতলই। মখ্‌দুম যে গুহায় থাকিতেন সম্ভব সেই গুহায়ই, অথবা সন্নিকটের বিপুলগিরি-গাত্রের অন্য গুহাগুলির কোনটিতে বুদ্ধ প্রথমবার রাজগৃহে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, কারণ পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পাণ্ডব পাহাড় = সম্ভব বিপুলগিরি। বুদ্ধ-প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্তও সম্ভব পরে মখ্‌দুম গুহায় থাকিতেন। ডকটর মজুমদার দেখাইয়াছেন যে, দেবদত্তের মৃত্যুস্থানরূপে চীনা পরিব্রাজকরা যে গুহার কথা বলিয়াছেন তাহা এই মখ্‌দুমগুহা, পুরাতত্ত্ব বিভাগ বর্ণিত সূর্যকুণ্ডের ধারের কোন স্থান নয়। মখ্‌দুমগুহা হইতে পাহাড়ের গায়ের সিঁড়ি দিয়া একটু উপরে উঠিলে এক জায়গায় পাথরের উপর লাল দাগ দেখা যায়। ইহা আসলে প্রাকৃতিক ভূতাত্ত্বিক কারণজাত, কিন্তু হিউয়েন ৎসাং এ সম্পর্কে একটি ভিক্ষুর আত্মহত্যার কাহিনী শুনিয়াছিলেন এবং মুসলমানরা এই দাগ সম্বন্ধে একটা বাঘের গল্প বলেন।

সূর্যকুণ্ডের পাশের মন্দিরগুলি আধুনিক। এগুলি যে প্রাচীন বাড়িঘর মন্দিরাদির বিধ্বস্ত অবশেষের উপর নির্মিত তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। বিপুলগিরির পাদদেশ ও বৈভারগাত্রে সাতধারার চারপাশ প্রাচীনকালে বহু মন্দিরাদিতে আচ্ছন্ন ছিল, প্রাচীন ভিত্তি-সমূহের বড় বড় পাথর ও ইটের গাঁথনি যত্র তত্র চোখে পড়ে। বিপুলগিরিতে উঠিবার যে রাস্তা আধুনিক জৈনরা তৈয়ারি করিয়াছেন, তাহার আরম্ভ সূর্যকুণ্ডের একটু দক্ষিণ-পূর্বে। বিপুলগিরি জৈনদের কাছে অতি পবিত্র, কারণ মহাবীর এখানে বাস ও ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। রাজগৃহের সব পাহাড়ের উপর যে সাদা মন্দিরগুলি

দেখা যায় তাহা আধুনিক কালে জৈনদের দ্বারা নির্মিত। যে যে পাহাড়ে উঠিবার বাঁধান রাস্তা আছে সেগুলিও জৈনরা আধুনিক কালে নির্মাণ করিয়াছেন। সূর্যকুণ্ডের ঠিক উত্তরপূর্বে বড় পাথরে গাঁথা যে চতুষ্কোণ উঁচু চবুতারার একটি গাত্র অবশিষ্ট আছে দেখা যায়, তাহাকে পুরাতত্ত্ব বিভাগ ভুল করিয়া দেবদত্তের সমাধিস্তূপ বলিয়াছেন; পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মখ্‌দুমগুহাই দেবদত্তের গুহা। এই চবুতারাটি জরাসন্ধকী বৈঠকের মত প্রহরীদের পর্যবেক্ষণ - মঞ্চ ছিল।

<u>২য় দিন বৈকাল</u>

বিপুলগিরি - আরোহণ

সব পাহাড়ের মধ্যে বিপুলগিরিতে উঠিবার রাস্তাই বেশ ভাল ও সহজ। পাহাড়ে আস্তে আস্তে, বেশি কথাবার্তা না বলিয়া এবং মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া উঠিতে হয়, কখনও দ্রুতবেগে ওঠা উচিত নয়, ইহা হৃদ্‌যন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর —"শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্।" বৈকালবেলায় বিপুলগিরিতে ও ভোরবেলায় বৈভারগিরিতে উঠিলে সূর্য সাম্‌নে থাকার অসুবিধা নিবারণ হয়। বিপুলগিরির শিরোদেশ হইতে বা নামিবার সময়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য মনোরম দেখায়। উঠিবার জন্য পুরা এক ঘণ্টা সময় দেওয়া উচিত। উপর হইতে উত্তরে রেল ষ্টেশন, সিলাও গ্রাম প্রভৃতির এবং দক্ষিণে গিরিমালার মধ্যবর্তী প্রাচীন নগরের উত্তরাংশের বেশ ধারণা হয়।

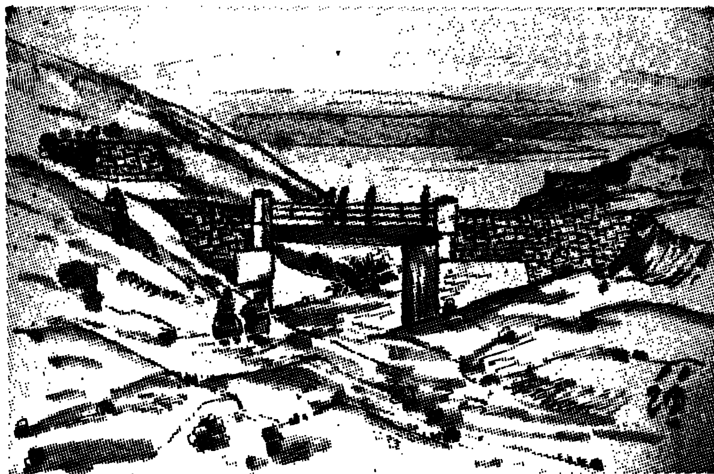
বিপুলগিরির শিখরের উচ্চতা সমুদ্রবক্ষ হইতে ১০৩৬ ফুট। উপরে উঠিতে অনেক ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। শিখরের বর্তমান জৈন

মন্দিরগুলি প্রাচীন গিরি-প্রাকারের ভিত্তির উপর নির্মিত হইয়াছে, তবে প্রাচীন মন্দিরাদিও সম্ভব ছিল। মন্দিরগুলির পূর্বদিকে স্তূপের মতটিও সম্ভব গিরি-প্রাকারের অংশ ছিল। ইহার কিছু উত্তর-পূর্বে মহাবীরের প্রথম ধর্মপ্রচারস্থান স্বরূপে একটি মর্মরফলক আধুনিক জৈনরা স্থাপনা করিয়াছেন। বিপুলগিরির শিখর হইয়া রত্নগিরিতে গিয়া সেখান হইতে অপরদিকে নামিলে দক্ষিণের প্রায় জীবকাম্রবনের কাছাকাছি পৌঁছান যায়; জৈনযাত্রীরা এই পথে পাঁচ-পাহাড় পরিক্রমা করেন; কিন্তু এই পথে যাইতে হইলে ভোরবেলায় বিপুলগিরিতে ওঠা আরম্ভ করিতে হয়। সাধারণ দর্শকের পক্ষে এ চেষ্টা না করাই ভাল।

গিরিপ্রাকার

রাজগৃহের সব পাহাড়ের উপর হইতে পর্বতমালার শিরোদেশের গিরিপ্রাকারের (Outer Fortification) এবং প্রাচীন নগরের নগরপ্রাচীরের (Inner Fortification) স্পষ্ট ধারণা হয়। পাহাড়ে উঠিবার সময়ে অনেক স্থানে গিরিপ্রাকারের অংশবিশেষের ভিত্তি দেখা যায় ও তাহার উপর দিয়া চলাও যায়। গিরিপ্রাকার সম্বন্ধে এখন সবচেয়ে ভাল ধারণা হয় প্রাচীন নগরের একেবারে দক্ষিণ-সীমায় বানগঙ্গার কাছে। এখানে প্রাকারের নিম্নাংশ অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায়।

এই গিরিপ্রাকার ছিল অতি আশ্চর্য জিনিষ। মোহেন্‌জোদড়ো ও হড়প্পা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে রাজগৃহের এই গিরিপ্রাকারই



বানগঙ্গার পুল পৃ ৭৩



মনিয়ার মঠ পৃ ৬৯

পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে ভারতীয় স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইত। ইহা কখন নির্মিত হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না, তবে ইহা যে অজাতশত্রুর রাজত্বকালের পরে নির্মিত নয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কারণ অজাতশত্রুর পর রাজগৃহের রাজধানীত্ব লোপ হইয়াছিল, অতএব নগররক্ষার আর কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। সম্ভব লিচ্ছবিদের সঙ্গে ১৬ বছর ধরিয়া যুদ্ধের সময়ে অথবা অবন্তী-রাজের আক্রমণের ভয়ে অজাতশত্রু রাজধানীরক্ষার জন্য এই প্রাকার নির্মাণ করিয়াছিলেন — ইহাই প্রাকার - নির্মাণকালের শেষ সীমা। কিন্তু ইহার পূর্বে বিম্বিসারের সময়ে অথবা তাহারও পূর্বে ইহা নির্মিত হইয়াছিল কিনা তাহা এখনও ঠিক বলা যায় না।

বিনা চূণ - শুর্কিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উপর উপর সাজাইয়া এই "সাইক্লোপিয়ান" দেওয়াল নির্মিত হয়। উদয়গিরি ও স্থানীয় অন্যান্য পাহাড় হইতে এই পাথর কাটা হইত। পুরাতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন যে, এই প্রাকারের বড় বড় পাথরের ভিত্তির উপর আদিতে ছোট পাথরের গাঁথনি ছিল, তাহার উপর পোড়া বা কাঁচা ইঁটের গাঁথনি এবং তাহারও উপর কাঠের নির্মাণ ছিল। অতএব আদিতে দেওয়ালের উচ্চতা এখন বানগঙ্গার কাছে যতটা দেখা যায় তাহারও চেয়ে অনেক বেশি ছিল। প্রাকারের চওড়াই বিভিন্ন স্থানে বেশি কম ছিল, কিন্তু সাধারণ চওড়াই ছিল ১৭।১৮ ফুট। সমগ্র গিরিশ্রেণীর উপর দিয়া ইহার মোট দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৩০ মাইল। প্রাকার দৃঢ়তর করিবার জন্য অনেক জায়গায় অল্প দূরে দূরে ইহার গায়ে অর্ধবৃত্তাকার বা চতুষ্কোণ গাঁথনি সংযোগ করা হইয়াছিল এবং নানা

স্থানে প্রাকারের শাখা - প্রশাখা ছিল। এই সবই ১ মানচিত্রে দেখান হইয়াছে এবং নানাস্থানে দর্শক নিজেও দেখিতে পাইবেন।

পাহাড়গুলির মধ্যে মধ্যে যেখানে গিরিবর্ত্মের মত ফাঁক আছে সেখানে এই প্রাকারের দ্বার ছিল, যেমন উত্তরে বিপুল - বৈভারের মধ্যে, পূর্বে শৈলগিরি - উদয়গিরির মধ্যে, দক্ষিণে উদয়গিরি - সোনাগিরির মধ্যে এবং পশ্চিমে সোনাগিরি - বৈভারের মধ্যে। এই প্রাকার-দ্বারগুলি প্রহরী ও সৈন্যদের দ্বারা সুরক্ষিত থাকিত। পাহাড়ের উপরে প্রাকারের কাছাকাছিও নানাস্থানে সৈন্যদের ঘাঁটি ও 'ব্যারাকের' মত ছিল মনে হয়।

সার জন মার্শালের মতে "জরাসন্ধকী বৈঠক" নামে পরিচিত চবুতারাটি সৈন্যদের পর্যবেক্ষণস্থান ছিল। ইহার গায়ের গুহাগুলি প্রহরীদের বাসকক্ষ ছিল। আদিতে ইহার বর্তমান ভিত্তির উপরও অনেক গাঁথনি ছিল সন্দেহ নাই। সূর্যকুণ্ডের উত্তরপূর্বে বিপুলগিরির তলায় এরূপ আর একটি প্রহরীস্থানের কথা পূর্বে বলিয়াছি। বোধহয় উত্তর দিক হইতেই শত্রুর আক্রমণের ভয় সবচেয়ে বেশি ছিল, কারণ অন্য কোন দিকে এরূপ চবুতারার চিহ্ন এখনও পাওয়া যায় নাই। লিচ্ছবি প্রভৃতিদের সঙ্গে অজাতশত্রুর দীর্ঘ যুদ্ধের সময়েও উত্তর হইতেই আক্রমণের আশঙ্কা বেশি ছিল।

৩য় দিন সকাল

তপোদা, তপোদারাম

বৈভারে উঠিবার আগে দর্শক বেণুবনের দক্ষিণপশ্চিমাংশ ও বৈভারের উত্তরগাত্র দেখিবেন। বেণুবনের দক্ষিণপশ্চিম সীমার

নীচে জলস্রোতটি প্রাচীন তপোদা ও বর্তমান সরস্বতী নদী। ঠিক বেণুবনের সীমার নীচে এই জলস্রোতে একটি বড় বড় পাথরের বাঁধ ছিল এবং বাঁধের উপর দিয়া সম্ভব অপর তীরের তপোদারামে যাইবার পথ ছিল। তপোদারামের কথা পালিশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, এই উপবনের মধ্যেও পরে বিহারাদি নির্মিত হইয়াছিল এবং এখন এখানে একটি সাধুসন্ন্যাসীর ঘাঁটি আছে। এই বাঁধের দ্বারা জল বাঁধিয়া সম্ভব নদীর উপরের কিছুদূর অংশ "তপোদা - সরোবরে" পরিণত করা হইয়াছিল। আধুনিক লোহার পুলের দক্ষিণে কোন কোন স্থানে নদীতীর 'কংক্রীট' - বাঁধান ছিল মনে হয়। রাজগৃহে অনেক জায়গায় যেখানে যেখানে জল ছিল সেখানে দর্শক এই প্রাচীন কংক্রীটের বড় বড় চাঁই দেখিবেন। ছোট ছোট পাথর, শুরকি চূণ ও অন্য কোন অজ্ঞাত মশলাদি দিয়া প্রস্তুত হইয়া ইহা এমন দৃঢ় হইত যে সমস্তটি একখণ্ড পাথরের মত মনে হয়।

পিপ্‌পলি গুহা

বিপুলগিরির মত বৈভারের তলদেশও বহু মন্দিরাদিতে আচ্ছন্ন ছিল। এখনকার মন্দির মসজিদ সিঁড়ি প্রভৃতি নীচে প্রাচীন ইঁটপাথরের চিহ্ন অনেক দেখা যায়। তপোদারাম ও গঙ্গাযমুনা - ধারা পার হইয়া একটু পশ্চিমে একটি বৃহৎ প্রাচীন পুষ্করিণী দেখা যায়। এই পুষ্করিণীর পূর্বসীমা বরাবর বৈভারগাত্রে একটু উপরে পূর্বমুখী যে গুহাটি, ডক্টর মজুমদার দেখাইয়াছেন যে তাহাই সম্ভব বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত বিখ্যাত 'পিপ্পলি-গুহা'। টীকাকাররা বলিয়াছেন সাম্‌নে একটি

অশ্বত্থগাছ (আধুনিক হিন্দিতেও অশ্বত্থকে পিপল্ বলে) থাকায় গুহার ঐ নাম হয়। বুদ্ধও সম্ভব কোন সময়ে এই গুহায় বাস করিয়াছিলেন। সারিপুত্র প্রভৃতি শিষ্যরাও পরে এখানে কখন কখন বাস করিতেন। ভিক্ষু মহাকাশ্যপ একবার এখানে বাস করার সময়ে খুব পীড়িত হইয়া পড়েন এবং বুদ্ধ তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া প্রবোধ সান্ত্বনা ও উপদেশ দেন।

পুরাতত্ত্ব বিভাগ বলিয়াছেন যে সৈন্যদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইবার পর জরাসন্ধকী বৈঠকের গায়ের কোন গুহাকেই সম্ভব বৌদ্ধরা পিপ্পলিগুহা বলিতেন; কিন্তু ইহা ঠিক মনে হয় না, কারণ বুদ্ধের সময়ে গিরিপ্রাকার ও এই সামরিক পর্যবেক্ষণ - মঞ্চ তৈয়ারি হইয়াছিল কিনা ঠিক বলা যায় না এবং যদি হইয়া থাকে তবে তাহা সৈন্যদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কেহ বলিয়াছেন জরাসন্ধকী বৈঠকের ঠিক পশ্চিমের পাহাড়ের গা হইতে পাথর কাটিয়া এই চত্বতারা নির্মিত হইয়াছিল এবং পাথর কাটার ফলে গিরিগাত্রে যে গুহাটির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল, এখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং ইহাই পিপ্পলিগুহা ছিল। এই ব্যাখ্যাও সঙ্গত মনে হয় না, কারণ সেপাইশাস্ত্রীর ঘাঁটির অত কাছে নির্জনবাসী ভিক্ষুরা আশ্রয়স্থান নির্মাণ করিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় না।

সপ্তপর্ণী স্তূপ ?

পিপ্পলিগুহার উত্তরের খোলা মাঠের মধ্যে এবং 'নূতন' রাজগৃহের পশ্চিমের অশোকস্তূপ পর্যন্ত এলাকায় সম্ভব বৌদ্ধশাস্ত্রের শীতবন ছিল। বুদ্ধ প্রায়ই শীতবনে থাকিতেন।

*[পিপ্পলিগুহার সাম্‌নে হইতে পশ্চিমে সপ্তপর্ণী গুহার সীমানা পর্যন্ত ভূভাগে অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, এই স্থানের পবিত্রতাবশত বোধহয় পরবর্তী কালে এখানে অনেক বিহার-স্তূপাদি নির্মিত হইয়াছিল। এদিকের বৈভারগাত্রে অনেক বড় - পাথরের গাঁথনির চিহ্ন এবং গুহাও আছে, এই গুহাগুলিতে সাধু - সন্ন্যাসীরা থাকিতেন। পাহাড়ের নীচে হইতে সপ্তপর্ণীতে উঠিবার জন্য বৈভারের উত্তর গাত্রে বেশ ভাল পথ যে ছিল তাহারও চিহ্ন আছে। এখন কিন্তু দর্শক এ পথে উঠিবার চেষ্টা না করিয়া একটু পরে বৈভাগের উপর দিয়া সপ্তপর্ণীর যে পথের বিবরণ দেওয়া হইবে, সেই পথে সপ্তপর্ণী গুহা দেখিবেন।]

[বৈভারের উত্তরের মাঠ হইতে উপরে তাকাইয়া সপ্তপর্ণী গুহা দেখা যায়। আরও মাইলখানেক পশ্চিমে গেলে বৈভারের তলদেশে উচু জায়গার উপর প্রকাণ্ড একটি গাঁথনির অবশেষে দেখা যায়। সার জন মার্শাল মনে করেন যে অজাতশত্রু প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির জন্য সপ্তপর্ণী গুহার সাম্‌নে বা কাছে যে মণ্ডপ তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিলেন, এই উঁচু গাঁথ্‌নি সেই মণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু ইহা ঠিক মনে হয় না, কারণ প্রথমত এই গাঁথনির কাছাকাছি গিরিগাত্রে কোন গুহা নাই যাহাকে সপ্তপর্ণী গুহা বলা যাইতে পারে এবং দ্বিতীয়ত অজাতশত্রু যাহা তৈয়ারি করাইয়া দিয়াছিলেন তাহা 'মণ্ডপ' বা

সময় বা শ্রম - সংক্ষেপেচ্ছু দর্শক ইচ্ছা করিলে এখানে ও পরে এইরূপ বড় বন্ধনীর মধ্যে বর্ণিত স্থানগুলি বাদ দিতে পারেন এবং সম্ভব হইলে সেই সময়ে পরে বর্ণিত স্থানগুলির যতটা পারেন দেখিয়া রাখিতে পারেন।

দ্রুতনির্মিত অস্থায়ী ছাউনিমাত্র ছিল। সপ্তপর্ণীর কাছে যে স্তূপের কথা ফা হিয়েন বলিয়াছেন, এই উঁচু গাঁথনি সেই (সম্ভবত অশোক - নির্মিত) স্তূপ হইতে পারে, অথবা সপ্তপর্ণীর স্মারক অপর কোন চৈত্যবিহারাদি এখানে পরে নির্মিত হয়। ফা হিয়েন ও হিউয়েন ৎসাং উভয়েরই বর্ণনা হইতে ঠিক বুঝা যায় না যে, তাঁহাদিগকে সপ্তপর্ণী বলিয়া যাহা দেখান হইয়াছিল তাহা গিরিগাত্রের অনেকটা পূর্বদিকে ও উপরের গুহাগুলি, না নীচের এই উঁচু গাঁথনিটি। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করিয়া মনে হয় উপরের গুহাগুলিই ছিল আসল সপ্তপর্ণী এবং সাধারণ লোকের মনে কালক্রমে নীচের স্তূপাদিও সপ্তপর্ণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছিল।]

৩য় দিন বৈকাল

জরাসন্ধকী বৈঠক, বৈভারের কুণ্ড ও ধারা

গঙ্গাযমুনা - ধারার দক্ষিণের পথ দিয়া জরাসন্ধকী বৈঠকে উঠিতে হয়। দর্শক এই দ্রষ্টব্যটি দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই নামিয়া আসিবেন, কারণ সন্ধ্যার পর বৈভারে বাঘ - ভালুক বাহির হইবার ভয় থাকে এবং পথও খারাপ।

নীচে ব্রহ্মকুণ্ড, সাতধারা (বা শতধারা ?) প্রভৃতির চারদিকে সর্বত্র প্রাচীন মন্দিরাদির অবশেষের উপর আধুনিক নির্মাণ। সাতধারার দক্ষিণে নিচু জায়গায় একটি পাথরবাঁধান বড় প্রাচীন পুষ্করিণী। বৈভারের জলধারাগুলি খুব গরম। বৈজ্ঞানিকপ্রবর জগদীশচন্দ্র

বসু মহাশয় বলিয়াছেন রাজগৃহের উষ্ণ প্রস্রবণগুলির জলে রেডিয়াম - শক্তি আছে। বাত - প্রভৃতি বেদনায় এই জলে স্নান করিয়া এবং হজমের রোগে এই জল গরম বা ঠাণ্ডা করিয়া পানে অনেকে খুব উপকার পাইয়া থাকেন। রাজগীরের অন্য কয়েকটি কূপের জলেরও হজ্‌মিগুণ আছে শুনা যায়।

৪র্থ দিন সকাল

বৈভারগিরিতে আরোহণ, সপ্তপর্ণী গুহা

জরাসন্ধকী বৈঠকের পাশ দিয়া বৈভারগিরিতে উঠিবার পথ। সব পাহাড়ের মধ্যে বৈভারে ওঠাই সবচেয়ে কষ্টসাধ্য, রাস্তাও ভাল নাই। উপরে সপ্তপর্ণী গুহা পর্যন্ত যাইতে হইলে উঠিবার জন্য অন্তত এক ঘণ্টা সময় দিতে হয়। উপরের সব দ্রষ্টব্য ঘুরিয়া দেখিতে হইলে আরও দুই তিন ঘণ্টা সময় হাতে রাখিতে হয়। উপরে উঠিবার সময়ে দুইদিকে অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এখানে কোন স্থানে বুদ্ধ একবার ধর্মশিক্ষা দিয়াছিলেন এবং সেখানে হিউয়েন ৎসাং একটি স্মারক স্তূপ দেখিয়াছিলেন। কিছুদুর উপরে উঠিয়া যেখানে পাথর-বাঁধান রাস্তার মত মনে হয়, আসলে তাহা গিরিপ্রাকারের একটি শাখার ভিত্তি। উপরের নূতন জৈন - মন্দিরগুলির দক্ষিণে একটি প্রাচীন জৈনমন্দির ও একটি প্রাচীন শিবমন্দির ভাঙ্গা অবস্থায় দেখা যায়।

তৃতীয় নূতন জৈনমন্দিরটির কাছে উত্তরদিকে যে পথ নামিয়া গিয়াছে তাহাতে অল্প দূর গেলে সপ্তপর্ণী গুহায় পৌঁছান যায়। বুদ্ধ কখন কখন এখানে বাস করিতেন। নিকটে সপ্তপর্ণী বা ছাতিম

গাছ থাকায় গুহার ঐ নাম হয়। মহাবস্তুতে আছে যে, গুহাগুলির পুরোভাগ প্রস্তরাবৃত ও বৃক্ষাদিযুক্ত সুচ্ছায় ছিল। হিউয়েন ৎসাং গুহার পুরোভাগ (পাহাড়ের নীচে ?) বাঁশবনে ঘেরা দেখিয়াছিলেন। গুহাগুলির পুরোভাগ এখন যতটা বিস্তৃত পূর্বে সম্ভব তার চেয়ে বেশি বড় ও পাথরবাঁধান ছিল। পুরাতাত্ত্বিকরা বলেন সেই প্রাঙ্গণ যে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে তাহার চিহ্ন এখনও বর্তমান। সম্ভব সেই প্রাঙ্গণের উপরই মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন হয়।

বৈভারের সর্বোচ্চ শিখরের উচ্চতা ১১৪৭ ফুট। বৈভারের উপর হইতে উত্তরদিকের সমতলভূমির আলবাঁধা খণ্ড খণ্ড নানা রঙের শস্যক্ষেত্রের শোভা বুদ্ধ একবার আনন্দকে দেখিতে বলিয়াছিলেন। বুদ্ধ বড়ই সৌন্দর্যপ্রিয় ছিলেন এবং সুন্দর কিছু দেখিলেই তাঁহার প্রশংসা করিতেন ও অন্যকে দেখাইতেন।

[তৃতীয় জৈনমন্দির হইতে আরও দক্ষিণের জৈনমন্দিরগুলির দিকে গেলে গিরিপ্রাকারের অনেক অংশ চোখে পড়ে। ঐদিকে পাহাড়ের উত্তর কোলে বাঁধ বাঁধিয়া একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী নির্মিত হইয়াছিল, তাহার জল নিয়মিত করিবার জন্য sluice gate ছিল। উপর হইতে পুষ্করিণীতে পৌঁছিবার জন্য সুন্দর প্রশস্ত বাঁধান ঢালু পথ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বৈভারের দক্ষিণপ্রান্তের শেষ জৈনমন্দিরের কাছে দাঁড়াইয়া চারদিকের পর্বতশিরে গিরিপ্রাকার, নীচে সাম্‌নে সমগ্র প্রাচীন নগর ও তাহার প্রাচীর, ডাইনে নগরপ্রাচীর ও গিরিপ্রাকারের মধ্যবর্তী শহরতলীর পুষ্করিণী প্রভৃতি, গিরিপ্রাকারের বাহিরে রণভূম প্রভৃতির খুব ভাল ধারণা হয়।]

৪র্থ দিন বৈকাল

গিরিপ্রাকারের উত্তর দ্বার, নগরপ্রাচীরের উত্তর ও উত্তরপশ্চিম দ্বার

এখন দর্শক গিরিপ্রাকারের উত্তরদ্বারের দিকে অগ্রসর হইবেন। বেণুবনের দক্ষিণসীমা ও দোকানপাটগুলি ছাড়াইয়া চলিবার সময়ে বামে বিপুলগিরির তলদেশ পর্যন্ত ও ডাইনে বৈভারের গায়ে ও তলদেশে অনেক ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যাইবে। উত্তরদ্বারে পৌঁছিবার পূর্বে রাস্তায় প্রাচীন জলনিকাশের পথ দেখা যায়, এখান দিয়া বিপুলগিরির বৃষ্টিজল নদীতে আসিয়া পড়িত। গিরিপ্রাকারের দ্বার-সংলগ্ন প্রহরীদের বাসকক্ষের চিহ্ন দেখা যাইবে। বিপুলগিরি হইতে গিরিপ্রাকার কিভাবে নামিয়া বৈভারে উঠিয়াছিল তাহার আভাসও পাওয়া যাইবে।

গিরিপ্রাকার ও দ্বারের বড় বড় পাথর ভূমিকম্পাদিতে ও বোধহয় শত্রুর আক্রমণেও স্থানচ্যুত হইয়া প্রাকারের সাম্‌নে পিছনে নানা-স্থানে পড়িয়া আছে। দ্বারের পশ্চিমদিকে নদীতীরে একটি শ্মশান, হয়ত প্রাচীনকালেও নগরপ্রাচীর ও গিরিপ্রাকারের মাঝখানে বা গিরিপ্রাকারের বাহিরে এখানে শ্মশান ছিল। প্রাকারদ্বারের পরেই খাল। প্রাচীন নগরের পূর্ব ও উত্তরদিকে এই খাল এবং পশ্চিমে নদী পরিখার কাজ করিত।

খালের পরেই নগরপ্রাচীরের উত্তরপশ্চিম দ্বার—পুরাতত্ত্ব বিভাগ ইহাকে নগরপ্রাচীরের উত্তরদ্বার বলিয়াছেন কিন্তু তাহা ঠিক নয়,

কারণ এই দ্বারের কিছু পূর্বদিকে যেখানে পূর্বদিক হইতে একটি খাল ও দক্ষিণদিক হইতে একটি খাল আসিয়া মিশিয়াছে, সেখানে নগর-প্রাচীরে একটি দ্বারের ও খালের উপর পাকা পুলের চিহ্ন আছে। বড় বড় কংক্রীট খণ্ড ভাঙিয়া খালের মধ্যে ও পাশে পড়িয়া আছে। ডক্টর মজুমদার বলিয়াছেন হিউয়েন ৎসাং নগরপ্রাচীরের উত্তরদ্বার বলিতে এই দ্বারটিই বুঝিয়াছিলেন, পুরাতত্ত্ব বিভাগ যাহাকে উত্তরদ্বার বলিয়াছেন তাহাকে নয়। অতএব পুরাতত্ত্ব বিভাগ যাহাকে উত্তর-দ্বার বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক উত্তরপশ্চিম দ্বার। এই দুই দ্বারের পূর্বে ও পশ্চিমে নগরপ্রাচীরের চিহ্ন ও অবশেষ দেখা যাইবে।

খাল পার হইবার পর বর্তমানের রাস্তার অল্প পশ্চিমে প্রাচীন রাজপথের ঢালুরেখা এবং এখানকার রাস্তা যেসব প্রাচীন বাড়িঘরের উপর দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার অনেক পরিচয় দর্শকের চোখে পড়িবে। একটু অগ্রসর হইয়া রাস্তার পূর্বদিকে এক জায়গায় বর্ষার জলনিকাশের পথে একটি গর্তের মত আছে, সেখানে প্রাচীন যুগের একটি রাস্তায় উপর্যুপরি সাতটি স্তর দেখা যায়। এখান হইতে পিছনে বৈভারের দিকে তাকাইলে গিরিপ্রাকারের রেখা দেখা যাইবে। এখান হইতে দর্শক আবার খালে ফিরিয়া খালের দক্ষিণ পাড় দিয়া সরস্বতীর দিকে যাইবেন।

নগরপ্রাচীরের উত্তরপশ্চিম কোণের উপরে মন্দিরটি আধুনিক, পাণ্ডারা ইহাকে জরারাক্ষসীর মন্দির বলে। প্রাচীরকোণ ঘুরিয়া পশ্চিমদিকের প্রাচীরের পাশ দিয়া দক্ষিণে অল্প গেলে প্রাচীরগাত্রে একটি কাটা দেখা যাইবে। এখানে বড় বড় মাটির কলসীতে রক্ষিত

মৃতাস্থি পোঁতা পাওয়া গিয়াছে, প্রাচীর গাত্রে এখনও কলসী ও অস্থির অবশেষ দেখা যায়। ইহা খুব প্রাচীন যুগের মৃতসৎকার-প্রথার পরিচায়ক, সে যুগে মৃতদেহ দাহ করিবার পর অস্থিগুলি মৃৎপাত্রে ভরিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হইত।

এখান হইতে দর্শক সন্ধ্যার মধ্যে নগরে ফিরিয়া আসিবেন কারণ প্রাচীন নগরে (Old Fort) রাত্রে বাঘ ভালুক ও বন্যশূকর বাহির হয়।

৫ম দিন সকাল

বলরাম মন্দির

"জরারাক্ষসীর মন্দির" - এর কাছে সরস্বতী পার হইয়া দর্শক নদীর পশ্চিম কূল ধরিয়া দক্ষিণে চলিলে অল্প পরেই একটি খুব বড় পাথরে গাঁথা ভিত্তি দেখিতে পাইবেন। এটি বোধহয় আদিতে স্তূপ ছিল, পরে ইহার উপর সম্ভব হিন্দুমন্দির নির্মিত হয়। খননের সময়ে এখানে বলরামের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া ইহাকে বলরাম - মন্দির বলা হয়।

সোনভাণ্ডার

আরও দক্ষিণে গেলে সোনভাণ্ডার। পাণ্ডাদের কাহিনী অনুসারে ইহা ছিল রাজা বিম্বিসারের স্বর্ণভাণ্ডার এবং ইহার ভিতরে দেওয়ালের রহস্যময় লিপিতে গুপ্তধন পাইবার পথের নির্দেশ আছে, যে এই লিপিরহস্য ভেদ করিতে পারিবে সেই রাজার গুপ্তধন পাইবে!

আসলে কিন্তু ইহা সাধুদের বাসের জন্য পাথরকাটা ঘর। ভিতরের দেওয়ালে (রহস্যময় !) ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, একজন জৈনসাধু তপস্বীদের বাসের জন্য ইহা খৃ. ৪ শতকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার ভিতরের মূর্তিগুলি জৈন তীর্থংকরদের। এই গুহাগৃহ পূর্বে· দ্বিতল ছিল, উপরের তলা এখন ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

রংভূম বা মল্লভূমি — জেঠিয়ান

[সোনভাণ্ডার হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে কিম্বদন্তীর মল্লভূমি, যেখানে ভীম জরাসন্ধকে মল্লযুদ্ধে বধ করেন। এখানে আসিবার পথে নগরপ্রাচীর, এবং গিরিপ্রাকারের যে শাখা বৈভার হইতে নামিয়া সমতলভূমির উপর দিয়া সোনাগিরিতে উঠিয়াছে তাহা পার হইয়া যাইতে হয়। মল্লভূমির মাটি প্রাকৃতিক কারণে নরম ও সাদা, পাণ্ডারা বলে জরাসন্ধ দুধ ও ঘি দিয়া মল্লভূমির মাটি নরম ও মিহি করিয়াছিলেন। বিহারী কুস্তিগিররা এই মাটি গায়ে মাখিয়া ও লইয়া গিয়া প্রায় ফুরাইয়া দিয়াছে। মল্লভূমি হইতে দক্ষিণপশ্চিমে যে পথ গিয়াছে, সেই পথে ৬ মাইল দূরে জেঠিয়ান - গ্রাম (যষ্টিবন, পালিতে লট্‌ঠিবন), এখানে অনেক ধ্বংসাবশেষ আছে।]

সোনাগিরি

[মল্লভূমি হইতে সোনভাণ্ডারের দিকে ফিরিবার সময়ে যে রাস্তা সোনভাণ্ডার হইতে মনিয়ার মঠের দিকে গিয়াছে সেই রাস্তায়

সরস্বতী পার হইয়া পূর্বদিকে একটু গেলেই যে পথ দক্ষিণে গিয়াছে সেই পথে সোনাগিরিতে উঠিতে হয়। পথে নগরপ্রাচীরের দক্ষিণ-দিকের শাখা পার হইতে হয়, সম্ভব এখানে একটি দ্বারও ছিল। সোনাগিরি হইতে প্রাচীন নগরের দক্ষিণাংশ ও নগরপ্রাচীর বেশ ভাল দেখা যায়। প্রাচীন নগরের দক্ষিণাংশই ছিল প্রাচীনতম অংশ, গিরিব্রজ বা কুশাগ্রপুর। এখানে ঘনসন্নিবিষ্ট বহু বাড়িঘর ও রাস্তার চিহ্ন আছে, কিন্তু এখন দুষ্প্রবেশ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন। সোনাগিরির উপরে উঠিলে গিরিপ্রাকারও বেশ ভাল দেখা যায়। সেখান হইতে গিরিপ্রাকারের উপর দিয়াও বানগঙ্গায় যাওয়া যায়।]

দর্শক এখন মনিয়ার মঠের দিকে না গিয়া সোনভাণ্ডারে আসিবার সময়ে যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন সেই পথে বাসায় ফিরিবেন। ইহাতে পথ কম হইবে।

৫ম দিন বৈকাল

মনিয়ার মঠ

গিরিপ্রাকারের উত্তর দ্বার দিয়া বর্তমান পাকা রাস্তা ধরিয়া দর্শক সোজা মনিয়ার মঠে আসিবেন। পথে দুই দিকে বাড়িঘরের ভিত্তি, ডাইনে প্রাচীন রাজপথের রেখা এবং বাঁয়ে একটি বড় ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করিবেন, ইহা একটি ছোট দুর্গের মত, বোধহয় নগররক্ষী প্রহরীদের আবাস ছিল। কয়েক জায়গায় অবস্থাপন্ন

লোকের প্রাচীরবেষ্টিত বাড়ির চিহ্ন আছে। মনিয়ার মঠের ঠিক সামনে ইঁটবাঁধান একটা প্রাচীন কূপ আছে।

মনিয়ার মঠ খননে এ পর্যন্ত ৫টি স্তর পাওয়া গিয়াছে। উপরের স্তরে জৈন বৌদ্ধ শৈব প্রভৃতি দেবালয় ছিল এবং নীচের স্তরে (খৃ. ১—২ শতক) প্রাপ্ত মূর্তি প্রভৃতি হইতে দেখা যায় যে, সে যুগে ইহা নাগনাগিনীপূজার ক্ষেত্র ছিল। মহাভারতে আছে মণিনাগ ছিলেন রাজগৃহের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং যক্ষযক্ষিনী-পূজাও ছিল রাজগৃহে খুব প্রসিদ্ধ। মনিয়ার মঠই সম্ভব ছিল বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত মণিমালকচৈত্য এবং জৈনশাস্ত্রোক্ত মণিভদ্র-যক্ষালয়। নাগনাগিনী ও যক্ষ-যক্ষিনী পূজা অনার্য ভারতীয় ধর্মের অঙ্গ ছিল। নাগযক্ষাদি বিবিধ অপদেবতার প্রাধান্যের জন্য রাজগৃহের এত খ্যাতি ছিল যে, এইসব অপদেবতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বৌদ্ধভিক্ষুরা রাজগৃহে আসিলে একটি "পরিত্রাণ-মন্ত্র" জপ করিতেন।

মনিয়ার মঠের চারপাশ খননের সময়ে বড় গর্তের মধ্যে পশ্বাদির কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল, সম্ভব এখানে পশুবলির প্রথাও ছিল। মহাভারতোক্ত জরাসন্ধের শিবলিঙ্গ-পূজা ও নরবলির স্থানও সম্ভব এখানে ছিল। এইসব কারণে মনে হয়, এই "মঠ"টি অতি প্রাচীন দেবস্থান ছিল; ইহার দক্ষিণে ছিল প্রাচীন নগর গিরিব্রজ এবং ইহাই ছিল সম্ভব নগরের প্রধান দেবালয়। গভীর খনন করিলে প্রাচীন যুগের পূজা, প্রাগার্য মগধের ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য এখানে আবিষ্কৃত হইবে সন্দেহ নাই। চারদিকের প্রাচীরের উপর দিয়া

বেড়াইলে বুঝা যার কালক্রমে এই মঠ কত বড় আকার ধারণ করিয়াছিল।

মনিয়ার মঠ হইতে দর্শক সন্ধ্যার পূর্বে শহরের দিকে রওনা হইবেন। পরদিন সকালে অনেক পথ হাঁটিতে হইবে, তাই আজ বৈকাল - সন্ধ্যায় বিশ্রাম করিবেন।

৬ষ্ঠ দিন সকাল

দর্শক যদি বানগঙ্গার দিক ও গৃধ্রকূট দেখা একই দিনে সারিতে ইচ্ছা করেন তবে মধ্যাহ্নের আহার, পানীয় জল ও স্নানের বস্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া রওনা হইবেন কারণ এই দুইদিক অর্থাৎ প্রাচীন নগরের দক্ষিণ ও পূর্ব দিক দেখিয়া ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইবে। অথবা যদি দুপুরের মধ্যে ফিরিতে হয় তবে অতি প্রত্যূষে রওনা হইতে হইবে এবং গতিবেগ দ্রুত করিতে হইবে।

পাকা রাস্তা ধরিয়া সোজা মনিয়ার মঠে পৌছিয়া দর্শক পাকা রাস্তা ছাড়িয়া মনিয়ার মঠের পূর্বদেওয়াল ঘেঁষিয়া যে পথ দক্ষিণে গিয়াছে সেই পথে চলিবেন, এই পথ প্রাচীন প্রশস্ত রাজপথ ছিল। পথের দুই পাশে বড় বড় বাড়ির ধ্বংসাবশেষ - শ্রেণীর ঢিবি পড়িয়া আছে ; পশ্চিমে সমগ্র গিরিব্রজ কাঁটাজঙ্গলে আচ্ছন্ন। জঙ্গলের মধ্যে একটু প্রবেশ করিলে এখানকার বাড়ি ঘর ও রাস্তাগুলির কিছু ধারণা হইবে।

কারাগৃহ

প্রাচীন রাজপথ দিয়া নগরপ্রাচীরে পৌছিবার কিছু আগে বাঁদিকে একটা বড় ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি সম্ভব বন্দীশালা ছিল কারণ

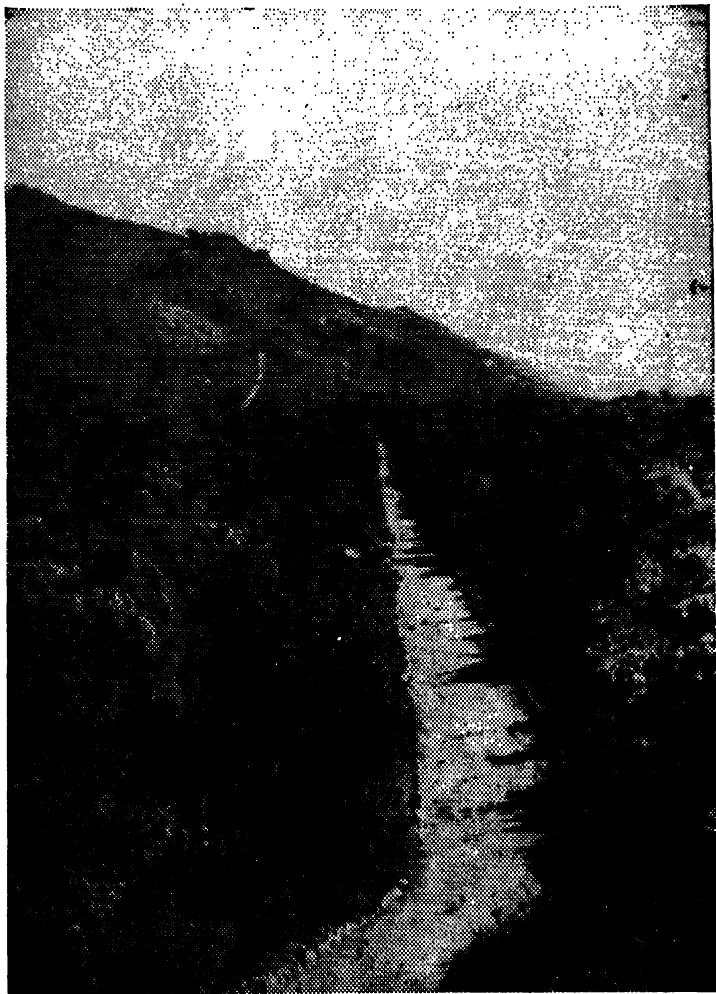
খননের সময়ে এখানে ভিত্তিসংলগ্ন লোহার আংটা পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে সম্ভব বন্দীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। অজাতশত্রু বোধহয় বিম্বিসারকে এখানেই বন্দী করিয়া রাখেন কারণ বর্ণিত আছে যে, বন্দীশালা হইতে বিম্বিসার গৃধ্রকূটশিরে বুদ্ধকে দেখিতে পাইতেন। এই স্থান ও গৃধ্রকূট বাস্তবিকই পরস্পরদৃশ্য।

প্রাসাদনগর

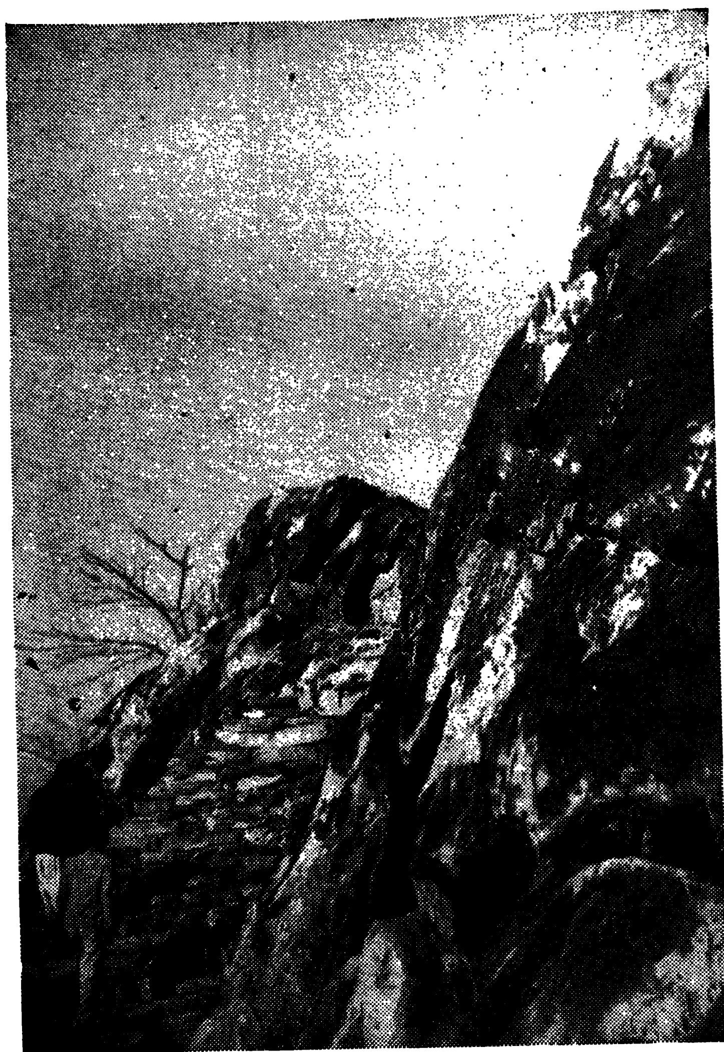
নগরপ্রাচীরে পৌঁছিলে যে দ্বারটি দেখা যায় তাহাকে দক্ষিণ-পশ্চিম দ্বার বলা হয়। কিন্তু হিউয়েন ৎসাং বর্ণিত প্রাসাদনগরের ইহা ছিল উত্তর-পশ্চিম দ্বার, ইহার দক্ষিণের অংশ ছিল রাজপ্রাসাদ-সমন্বিত প্রাসাদনগর। নগরপ্রাচীরের অল্প পরে ডানদিকে একটু দূরে একটা প্রাচীন কূপ আছে, ইহা সম্পূর্ণ পাথর কাটিয়া খনিত হইয়াছে। প্রাচীন রাজপথ এই অঞ্চলে ধনুকের মত বাঁকিয়া যেখানে আধুনিক পাকা রাস্তার সঙ্গে মিলিয়াছে, পুরাতাত্ত্বিকেরা তাহার নির্মাণকৌশলের প্রশংসা করেন; ঢালু জমির উপর হইলেও রাস্তার চড়াই খুব অল্পে অল্পে বাড়িয়াছে।

রাজপ্রাসাদ — শেল্ (shell)-লিপি

প্রাচীন ও আধুনিক রাস্তার সংযোগস্থলের পশ্চিমে জঙ্গলে আচ্ছন্ন অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ডক্টর মজুমদার হিউয়েন ৎসাং-এর বিবরণ হইতে অনুমান করিয়াছেন যে বিম্বিসারের রাজ-প্রাসাদ সম্ভবত এখানে ছিল।



গৃধ্রকূটের পথ



গৃধ্রকূটের সিঁড়ি

পৃ ৩০, ৭৬

একটু অগ্রসর হইয়া বামে একটি এলাকায় অনেকখানি জায়গার উপর মাটিতে পাথরের উপর অদ্ভুত অক্ষরে কি যেন সব লেখা। এখানে পাথরের উপর গাড়ির চাকার গভীর দাগ হইতে মনে হয় ইহা রাস্তা ছিল। যাহাতে লিপিগুলি নষ্ট না হয় সেজন্য এখন এখানে দেওয়াল ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অদ্ভুত অক্ষরকে পণ্ডিতরা shell (ঝিনুক) লিপি বলেন, ইহার রহস্য এখনও ভেদ হয় নাই। এই অক্ষরের লিপি রাজগৃহের আরও অনেক স্থানে দেখা যায়, সাতধারার একটি উষ্ণজল - প্রণালী মেরামতের সময়ে মাটির তলায় একটি পাথরেও এই লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই লিপির চাবিকাঠি যেদিন আবিষ্কৃত হইবে সেদিন রাজগৃহ তথা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আমাদের জ্ঞানগোচর হইবে। ["শেল" - লিপির কাছ দিয়া উদয়গিরিতে উঠিবার পথ।] আরও একটু দক্ষিণে রাস্তার বাম পার্শ্বে দুইটি ছোট স্তূপের অবশেষ।

বানগঙ্গা — গিরিপ্রাকারের দক্ষিণদ্বার

বানগঙ্গার মুখের কাছে সোনাগিরি ও উদয়গিরির গিরিবর্ত্মে গিরিপ্রাকারের দক্ষিণদ্বার। পূর্বে বলিয়াছি এখানেই গিরিপ্রাকার সবচেয়ে দেখিবার মত ; দর্শক সোনাগিরিতে উঠিয়া প্রাকারের আয়তন দেখিবেন। প্রাকারের বাহিরে দক্ষিণেও কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। রাস্তা এখানে গয়ার দিকে গিয়াছে।

সকাল ৮টা, সাড়ে ৮টার মধ্যে এখান হইতে গৃধ্রকূটের দিকে রওনা হইতে না পারিলে "শেল" লিপির কাছাকাছি খালের ধারের গাছের

ছায়ায় পাথরের উপর দর্শক বিশ্রাম ও আহারাদি করিবেন। বানগঙ্গা বা খালের জলে স্নানাদি সারিয়া লইবেন কিন্তু এ জল পান করিবেন না।

৬ষ্ঠ দিন বৈকাল

বেলা ২টা আন্দাজ এখান হইতে রওনা হইয়া যে প্রাচীন রাজপথে মনিয়ার মঠ হইতে আসিয়াছিলেন তাহা বাঁয়ে রাখিয়া দর্শক আধুনিক রাস্তা ধরিয়া নগরপ্রাচীরের যে দ্বারে উপস্থিত হইবেন তাহাকে দক্ষিণদ্বার বলা হয়। এই দ্বারকেই সম্ভব হিউয়েন ৎসাং প্রাসাদ-নগরের উত্তর-দ্বার বলিয়াছেন কিন্তু জ্যাক্‌সন সাহেব ও ডক্‌টর মজুমদারের মতে ইহাকে পূর্বদ্বার বলাই বেশি সঙ্গত হয়। প্রাচীন-কালেও বোধ হয় এই দ্বারকে প্রাসাদ-নগরের পূর্বদ্বার বলা হইত। সুত্তনিপাতটীকায় আছে বুদ্ধ ভিক্ষায় বাহির হইলে যেদিন প্রাসাদের উপর হইতে বিম্বিসার তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন সেদিন বুদ্ধ 'পূর্বদ্বার' দিয়া নগরে (নিশ্চয় প্রাসাদ নগরে, কারণ অন্যত্র হইলে প্রাসাদ হইতে বিম্বিসার তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন না) প্রবেশ ও নগর হইতে বাহির হইয়াছিলেন। অনেকে এই পূর্বদ্বারকে নগরপ্রাচীরের পূর্বদ্বার বা উদয়গিরি ও শৈলগিরি গিরিবর্ত্মে ৪।৫ মাইল দূরের গিরিপ্রাকারের পূর্বদ্বার ধরিয়াছেন, কিন্তু সে সময়ে বুদ্ধ যদি পাণ্ডব-পাহাড়ে (=বিপুলগিরি) থাকিতেন তবে সেখান হইতে শেষোক্ত পূর্বদ্বার দুইটির যে কোনটি দিয়া নগরে প্রবেশ করিতে হইলে বুদ্ধকে গিরিয়াক হইয়া ১০।১২ মাইল ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছিল কারণ গিরি-প্রাকার (অবশ্য যদি তাহা তখন থাকিয়া থাকে) ও নগরপ্রাচীর পার

হইবার অন্য উপায় ছিল না। অবশ্য ইহা হইতে পারে যে, বুদ্ধ পাণ্ডব-পাহাড় হইতে গিরিয়াকে গিয়া এক বা ততোধিক দিন থাকিয়া সেখান হইতে গৃধ্রকূট হইয়া রাজগৃহের প্রাসাদনগরে আসিয়া পুনরায় পাণ্ডব-পাহাড়ে ফিরিয়াছিলেন, যদিও বর্ণনায় তাহা যেন সব একই দিনের ঘটনার মত বলা হইয়াছে, অথবা হয়ত পরে গৃধ্রকূট বুদ্ধের প্রিয় বাসস্থান হইয়াছিল বলিয়া সুত্তনিপাত-টীকাকার ভুল করিয়া মনে করিয়াছিলেন সেদিনও বুদ্ধ গৃধ্রকূট হইতে নগরে আসিয়াছিলেন।

যাহা হউক, সম্ভব নগরপ্রাচীরের এই দ্বারের কাছেই হিউয়েন ৎসাং কয়েকটি স্মারক স্তূপ দেখিয়াছিলেন, যেখানে বুদ্ধশিষ্য অশ্বজিতের সঙ্গে সারিপুত্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, যেখানে অজাতশত্রু মাতাল হাতি লাগাইয়া বুদ্ধকে বধ করিবার চেষ্টা করেন প্রভৃতি। এখান হইতে পূর্বদিকের গভীর খালে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া শ্রীগুপ্ত নামক এক ব্যক্তি বুদ্ধকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দ্বারের অল্প উত্তর-পূর্বে গৃধ্রকূটে যাইবার রাস্তা।

নগরপ্রাচীরের পূর্বদ্বার— জীবকাম্রবন

গৃধ্রকূটের রাস্তা ধরিয়া চলিলে অদূরে নগরপ্রাচীরের পূর্বদ্বার, [ইহার কিছু উত্তরে একটি স্তূপাবশেষ আছে।] পূর্বদ্বারের পরেই খালের উপর পুল। এই খাল নগরপরিখা ছিল এবং ইহার তলদেশ পাথর-বাঁধান ছিল ; পরিখার উপর দিয়া প্রাচীন যুগেও পুল ছিল, বর্তমান পুলের নীচে পরিখাগাত্রের পাথরে প্রাচীন পুলের কড়িকাঠ বসাইবার খাঁজ কাটা দেখা যায়। উদয়গিরি হইতে গিরিপ্রাকারের যে শাখা

নামিয়া রত্নগিরিতে উঠিয়াছে, তাহা একটু পরেই দেখা যায়। এইখানে ছিল রাজ-চিকিৎসক জীবকের আম্রবন, যাহা জীবক বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন। বামদিকের জঙ্গলে অনেক ধ্বংসাবশেষ আছে, সম্ভব জীবকাম্রবনে যে বিহারাদি পরে তৈয়ারি হইয়াছিল এগুলি তাহারই।

গৃধ্রকূট

মাইলখানেক পরে গৃধ্রকূটের পাদদেশে পৌঁছিয়া পাহাড়ের গায়ের রাস্তা দিয়া প্রায় ১ মাইল উঠিলে শিখরে পৌঁছান যায়। পাহাড়ের এই রাস্তা বিম্বিসার নির্মাণ করিয়াছিলেন, পথে দুইটি ছোট স্তূপের ভিত্তি দেখা যায়। দেখিতে শকুনের মত ছিল অথবা উপরে শকুন বসিত বলিয়া এই শিখরের নাম গৃধ্রকূট হয়।

শিখরের নীচের দিকের গুহাগুলি আনন্দ সারিপুত্রাদি প্রধানশিষ্যদের গুহা বলিয়া এবং উপরের যে গুহার ছাদের পাথর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহা বুদ্ধের বাসগুহা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বুদ্ধের জন্মস্থান আজ নেপাল - তরাই - এর জনশূন্য বনের মধ্যে ; তাঁহার মৃত্যুস্থান কুশীনগর, বহুকালের বাসস্থান শ্রাবস্তীর জেতবন - বিহার ও রাজগৃহের বেণুবন - বিহার নিশ্চিহ্ন এবং তাঁহার স্মৃতিজড়িত অন্যান্য স্থানগুলি ঠিক কোথায় ছিল তাহাও দুর্জ্ঞেয়। তাই গৃধ্রকূটের এই গুহা আজ বৌদ্ধজগতের মহাতীর্থ। এখানে বুদ্ধ যেসব ধর্মশিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই বলিয়া ভক্ত ফা হিয়েন এখানে আসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন।

শিখরের পূর্বদিকে বুদ্ধ পায়চারি করিয়া বেড়াইবার সময়ে দেবদত্ত

উপর হইতে পাথর গড়াইয়া তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সমতল স্থানে বসিয়া বুদ্ধ লোককে ধর্মশিক্ষা দিতেন তাহা পাথর - বাঁধান প্রাঙ্গণের মত।

গৃধ্রকূটের পূর্বদিকে পাহাড়ের গায়ে অনেক বড় বড় পাথরের গাঁথনির ভিত্তি আছে। উত্তরে ছঠাগিরির সর্বোচ্চ স্থানে (১১৪৭ ফুট) একটি স্তূপ ছিল, সম্ভব ইহা অশোকনির্মিত। [স্তূপে যাইবার পথ দুর্গম। সকালবেলায় গৃধ্রকূটে না আসিলে দর্শক এই স্তূপে যাইবার চেষ্টা করিবেন না।]

সমগ্র গৃধ্রকূট শিখরের উপর যুগে যুগে বহু পাথর ও ইঁটের চৈত্যবিহার - স্তূপাদি নির্মিত হইয়াছিল। শিখর হইতে পূর্ব - দক্ষিণে দুরে পঞ্চনানদী (প্রাচীন সর্পিণী) দেখা যায়। [৪।৫ মাইল পূর্বদিকে উদয়গিরি ও শৈলগিরির মধ্যবর্তী বর্ত্মে গিরিপ্রাকারের পূর্বদ্বার। গিরিয়াক হইতে এই দ্বার দিয়া রাজগৃহে আসিতে হয়।]

গৃধ্রকূট শিখরের দক্ষিণ - পাদদেশে ছিল মদ্দকুচ্ছি - মৃগোদ্যান; ইহার কাছে যে পুষ্করিণীটি দেখা যায় তাহাই সম্ভব বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত রাজবংশীয়া মাগধীদেবীর সুমাগধ - পুষ্করিণী, ইহারই সন্নিকটে ছিল একটি মোর - নিবাপ বা ময়ূর চরিবার স্থান। দর্শক গৃধ্রকূট শিখরে দাঁড়াইয়া দক্ষিণে নীচে তাকাইলেই এগুলি বুঝিতে পারিবেন। [প্রাচীনকালে মদ্দকুচ্ছি হইতে গৃধ্রকূট শিখরে উঠিবার যে পথ ছিল এখনও তাহার চিহ্ন দেখা যায়।]

ফিরিবার সময়ে গৃধ্রকূটের পথ যেখানে বর্তমানের পাকা রাস্তায় পড়িয়াছে সেখান হইতে দর্শক বর্তমান রাস্তা ধরিয়া উত্তরদিকে মনিয়ার

মঠের দিকে অগ্রসর হইলে কিছু পরে বামে কারাগৃহ ও তাহার পর আরও একটি বড় ধ্বংসাবশেষ পাইবেন। এই দ্বিতীয় ধ্বংসাবশেষটির পর আর মনিয়ার মঠের দিকে না গিয়া পাকা রাস্তা ছাড়িয়া দর্শক ডাইনের কোন কাঁচা পাদপথ ধরিয়া গিরিপ্রাকারের উত্তরদ্বারে পৌঁছিতে পারিবেন, ইহাতে দূরত্ব কিছু কম হইবে ও প্রাচীন নগরের এই অংশও দেখা হইবে। এই অংশে বিশেষ ঘন বসতি বোধহয় ছিল না কিন্তু কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ তবুও আছে। একটি বড় ধ্বংসাবশেষকে স্থানীয় কিম্বদন্তীতে বিম্বিসারের গোশালা বলা হয়।

নালন্দা

প্রাচীন ইতিহাস

নালন্দার প্রথম উল্লেখ বৌদ্ধ জৈন শাস্ত্রে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, সে যুগে নালন্দা খুব সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। এখানকার প্রাবারিক - আম্রবন (এই আমবাগানের মালিক সম্ভব 'প্রাবরণ' বা উত্তরীয়াদি পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবসা করিত) নামক স্থানে বুদ্ধ অনেকবার রাজগৃহ যাতায়াতের পথে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। নালন্দা অঞ্চলে মহাবীরের অনেক শিষ্য ছিল, তিনিও প্রায়ই নালন্দায় আসিতেন। একবার বুদ্ধ ও মহাবীর দুইজনেই একসময়ে নালন্দায় আসেন। একজন মহাবীরশিষ্য সে সময়ে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং ইহা লইয়া নিগ্রর্ন্থদের (জৈন) মধ্যে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

নালন্দা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে চীনা পরিব্রাজকরা শুনিয়াছিলেন যে এখানে একটি সরোবরে নালন্দা নামে একটি নাগ থাকিত ; অথবা বোধিসত্ত্ব এক পূর্বজন্মে এখানকার রাজা ছিলেন, তিনি এত দানশীল ছিলেন যে "দিব না" এমন কথা কখনও বলিতেন না, তাই "ন অলং দা" হইতে নালন্দা নামের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এসব কিম্বদন্তীর কোন মূল্য নাই। বোধহয় পদ্মবন হইতে এই নামের উদ্ভব হইয়া থাকিবে (নাল = পদ্ম, ষণ্ড = সমূহ)। সেকালে এখানে অনেক পদ্মবন ছিল, এখনও আছে। নালন্দ নামও বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়। নাল, নালক

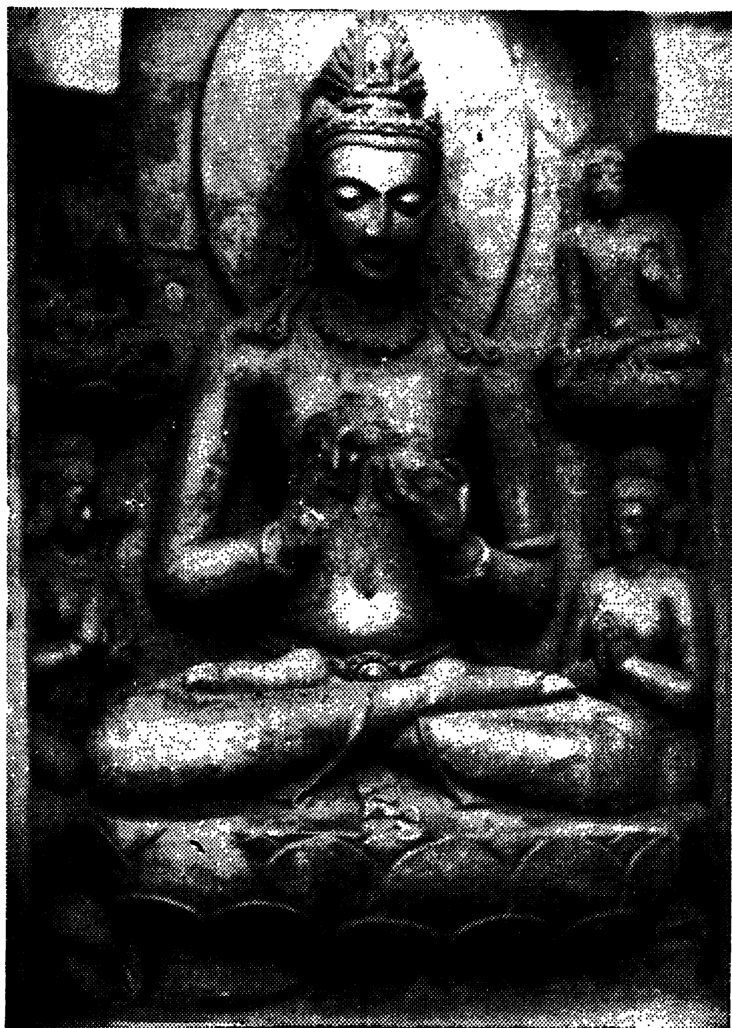
প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত স্থানও বোধহয় নালন্দার অংশবিশেষ ছিল। সারিপুত্রের জন্ম ও মৃত্যুস্থান বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধ।

তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথ বলিয়াছেন যে, অশোক সারিপুত্রের চৈত্যে পূজা ও স্তূপনির্মাণ করিয়াছিলেন। ফা হিয়েন সারিপুত্রের এই ধাতুস্তূপ দেখিয়াছিলেন। বোধহয় নালন্দার আধুনিক সারিচক নামক পল্লী সারিপুত্রের নামের স্মারক। ফা হিয়েন নালন্দা মহাবিহারের কোনই উল্লেখ না করায় মনে হয় সে সময় পর্যন্ত নালন্দার বিহার খুব ছোটই ছিল। খৃ. ২ শতকের নাগার্জুন, ৪ শতকের আর্যদেব, ৫ শতকের অসঙ্গ, বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের নালন্দা বিহারে অধ্যয়ন - অধ্যাপনাদির যে উল্লেখ তিব্বতীগ্রন্থে পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নয়। আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন খৃ. ৫ শতকের মাঝামাঝি গুপ্তবংশীয় রাজা ১ম কুমারগুপ্তের সময় হইতে মহাবিহার আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজারা ইহার বৃদ্ধিসাধন করেন, ইঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধ ছিলেন।

৭ শতকের প্রথমার্ধে হিউয়েন ৎসাং দুইবারে প্রায় ৩ বৎসর নালন্দায় বাস করিয়াছিলেন এবং এই শতকের শেষাংশে ই ৎসিং ১০ বছর এখানে অধ্যয়ন করেন। নালন্দার পণ্ডিতরা হিউয়েন ৎসাঙ্‌কে রাজসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসগৃহ পরিচারক প্রভৃতি ছাড়া তিনি পথে বাহির হইলে একটি সুসজ্জিত হস্তী তাঁহার পিছনে চলিবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই যুগে প্রায় ৩।৪ হাজার ছাত্র এই মহাবিহারে অধ্যয়ন করিত। রাজাদের দানাদি হইতে ছাত্রদের আহারাদির ব্যবস্থা হইত। এখানকার পণ্ডিত ও ছাত্রেরা



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ



নালন্দার বোধিসত্ত্ব মূর্তি

বিদ্যা ও সদাচারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এখানকার জীবন কঠিন নিয়মাধীনে পরিচালিত হইত। জলঘড়ি হইতে নির্ণীত সময় - সঙ্কেতে এখানকার সমস্ত কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হইত।

সুবিদ্বান দ্বারপণ্ডিতরা গল্প ও কথোপকথনচ্ছলে কয়েকদিন বিশেষ পরীক্ষা করিয়া সমগ্র ভারত হইতে সমাগত প্রবেশপ্রার্থী ছাত্রদের বিহারে ছাত্রত্ব দান করিতেন। এই পরীক্ষা এত কঠিন ছিল যে প্রতি দশজন প্রবেশপ্রার্থীর মধ্যে সাত - আটজনকে ফিরিয়া যাইতে হইত। অধ্যাপক ও ছাত্রদের অধ্যয়ন - অধ্যাপনাদি শতাধিক মণ্ডলী বা "ক্লাসে" সারাদিন ধরিয়া চলিত। শুধু বৌদ্ধশাস্ত্র নয়, বেদ সাহিত্য দর্শন ব্যাকরণ ন্যায় আয়ুর্বেদ রসায়ন ধাতুবিদ্যা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে এখানে চর্চা হইত।

হিউয়েন ৎসাঙের সময়ে সমতটের (দক্ষিণ - পূর্ব বাঙ্‌লাদেশ) রাজবংশজাত ভিক্ষু শীলভদ্র এখানকার মহাস্থবির বা প্রধানাচার্য ছিলেন, শীলভদ্রের পূর্বে দক্ষিণভারতের কাঞ্চীপুরবাসী ভিক্ষু ধর্মপাল প্রধানাচার্য ছিলেন, শীলভদ্র তাঁহার ছাত্র ছিলেন। হিউয়েন ৎসাং শীলভদ্রের কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শীলভদ্রের অগাধ পাণ্ডিত্য ও পূতচরিত্রের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। আধুনিক সিলাও গ্রামের নাম হয়ত শীলভদ্রের অথবা শীলাদিত্যের (রাজা হর্ষবর্ধনের) নামানুসারে হইয়া থাকিতে পারে। শীলভদ্রের পর সম্ভব ধর্মকীর্তি প্রধানাচার্য্য হইয়া - ছিলেন। হিউয়েন ৎসাংকে নালন্দা হইতে "মোক্ষাচার্য" উপাধি দান করা হয়। তিনি স্বদেশে ফিরিবার পরও নালন্দার পণ্ডিতরা দেবপূজায় তাঁহাকে স্মরণ করিতেন এবং তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতেন ও উপহার পাঠাইতেন।

হিউয়েন ৎসাং নালন্দার একটি ৬ তলার সমান উঁচু বাড়িতে ৮০ ফুট উচ্চ একটি তাম্রের বুদ্ধমূর্তি দেখিয়াছিলেন, ইহা মৌর্যবংশীয় রাজা পূর্ণবর্মণ দ্বারা ৬ শতকের প্রথমাংশে স্থাপিত হইয়াছিল। হিউয়েন ৎসাঙের নালন্দায় বাসের সময়ে সম্রাট হর্ষবর্ধন এখানে একটি পিত্তলের পাতমোড়া বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মহাবিহারের ব্যয়নির্বাহের জন্য হর্ষ শতাধিক গ্রাম নিষ্কর করেন, এইসব গ্রামের দুইশত গৃহস্থ প্রত্যহ মহাবিহারে চাল ঘি ও দুধ জোগাইতেন। হর্ষ নিজেকে নালন্দাপণ্ডিতগণের দাস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জে হর্ষ যে ধর্ম - মহাসম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে নালন্দা হইতে "এক সহস্র" ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন।

৮ শতকের প্রারম্ভে কান্যকুব্জরাজ যশোধর্মদেবের মন্ত্রীপুত্র মালাদ নালন্দা মহাবিহারে বহু সম্পত্তি দান করেন। তাঁহার উৎকীর্ণ শিলালিপিতে তিনি নালন্দার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে সে যুগের মহাবিহারের শ্রীসমৃদ্ধির স্পষ্টছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে :

"সৎশাস্ত্র ও নানা বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের জন্য প্রখ্যাত ভিক্ষুসঙ্ঘ - সমন্বিত নালন্দা মহানরপতিগণের মহানগরীসমূহকেও যেন উপহাস করে ; নালন্দার গগনচুম্বি - প্রাসাদশিখরশ্রেণী যেন বিধাতা কর্তৃক ধরিত্রীর কণ্ঠমালারূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল" ;

"নানাশাস্ত্রবিশারদ ভিক্ষুমণ্ডলীর রমনীয় নিকেতন ও নানারত্ন - দ্যুতিদীপ্ত - বিহারচৈত্যসমন্বিত নালন্দা বিদ্যাধরকুল - নিকেতন সুরম্য সুমেরুগিরির শোভা ধারণ করিয়া আছে ; যেন কৈলাসগিরিকে

অপমান করিবার জন্যই রাজা বালাদিত্য* এখানে বুদ্ধের নামে অপরূপ সুবৃহৎ শ্বেত-প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন ;"

"সেই প্রাসাদ সমগ্র পৃথিবী পর্যটন, চন্দ্রলাবণ্যে কলঙ্কারোপ ও হিমালয়শৃঙ্গরাজির রূপনাশ করিয়া, স্বর্গগঙ্গার শ্বেতশোভা অপহরণ ও সমালোচক - সাগরকে নিস্তব্ধ করিয়া যে জগতে পরাজয় করিবার আর কিছু নাই সেখানে পর্যটন নিরর্থক বুঝিয়া যেন স্বোপার্জিত কীর্তিস্তম্ভস্বরূপে এখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।"

হিউয়েন ৎসাঙের স্বদেশীয় বন্ধু - রচিত জীবনচরিতেও নালন্দার বহুবিচিত্র - কারুকার্যমণ্ডিত বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত গগনস্পর্শী প্রাসাদশ্রেণীর উল্লেখ আছে।

গৌড়ের পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজারা পরম - বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল ৮ শতকের শেষাংশে মগধ অধিকার করিয়া নালন্দা হইতে পণ্ডিতদের লইয়া উদ্দণ্ডপুরে (বা ওদন্তপুরী বা ওতন্তপুরী, বর্তমান বিহার - শরীফ) মহাবিহার স্থাপন করেন। তিব্বতের সঙ্গে নালন্দার যোগ এই সময় হইতে আরম্ভ হয়। তিব্বতরাজের নিমন্ত্রণে পণ্ডিত শান্তরক্ষিত নালন্দা হইতে তিব্বতে গিয়া বাস করেন এবং সেখানে ৭৬২ খৃ. তাঁহার মৃত্যু হয়। পণ্ডিত পদ্মসম্ভবও এই সময়ে নালন্দা হইতে তিব্বতে যান। পদ্মসম্ভব তিব্বতের লামাধর্মের প্রবর্তক।

৯ শতকের প্রারম্ভে রাজা ধর্মপাল সমগ্র উত্তরভারত জয় করিয়া

* গুপ্তবংশীয় রাজা, মৃত্যু খৃ. ৫১১।

পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন ও বিক্রমশিলা-মহাবিহারের (ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের লুপ লাইনে সাহেবগঞ্জ ও ভাগলপুরের মধ্যবর্তী কহল্‌গাঁও ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল) প্রতিষ্ঠা করেন। বিক্রমশিলায়ও নালন্দার পণ্ডিতরা অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। পালবংশীয় রাজারা সোমপুর (রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর), জগদ্দল (উত্তরবঙ্গের কোন স্থান) প্রভৃতি স্থানেও মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কিন্তু সকলেই নালন্দায় প্রভূত অর্থসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ উদ্দণ্ডপুরে রাজধানী স্থাপনও করিয়াছিলেন।

নালন্দায় প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে দেখা যায় যে, বিপুলশ্রীমিত্র নামক একজন ভিক্ষু সোমপুরবিহারে তারাদেবীর মন্দির স্থাপন, একটি বিহারের সংস্কার এবং নালন্দায় "ধরিত্রীর ভূষণস্বরূপ ও ইন্দ্রপুরী বৈজয়ন্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ" একটি বিহার নির্মাণ করেন। সুবর্ণদ্বীপের (বর্তমান সুমাত্র) অধিপতি বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দূতমুখপ্রেরিত অনুরোধে এই বিহারের পুঁথিনকল ও ভিক্ষুদের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজা দেবপাল (৯ শতকের মধ্যভাগে) পাঁচ খানি গ্রাম নিষ্কর করিয়া দেন। আর একটি শিলালিপিতে জানা যায় যে, ১০ শতকের শেষভাগে নালন্দা অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হইবার পর আবার নির্মিত হয়; ইহা সম্ভব রাজা মহীপালের কীর্তি।

১১-১২ শতকে নালন্দায় নকল করা মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত "অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা" নামক শাস্ত্রগ্রন্থের পুঁথি নেপালে, লণ্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে ও অক্সফোর্ডের

বডলিয়ান লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। সেই যুগের মাগধী ভাষা ও লিপি হইতে বাঙলা ভাষা ও লিপির উদ্ভব হয় এবং মাগধীলিপি তিব্বতীলিপিরও জননী। নালন্দা হইতে যেমন চীনে, তেমনি নালন্দা ও বিক্রমশিলা - উদ্দণ্ডপুর প্রভৃতি হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রাদি প্রচারিত হয়। ভারতীয় বহু গ্রন্থের অনুবাদ চীনা ও তিব্বতীতে করা হইয়াছিল। বিক্রমশিলার ইতিহাসও ভারত ও বঙ্গের প্রাচীন গরিমার এক সমুজ্জ্বল অধ্যায় কিন্তু এখানে তাহার চর্চা করিব না।

তিব্বতীগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে নালন্দায় রত্নসাগর রত্নোদধি ও রত্নরঞ্জক নামক তিনটি প্রাসাদে গ্রন্থাগার রক্ষিত হইত এবং মহা - বিহারের যে অংশে এই প্রাসাদত্রয় অবস্থিত ছিল তাহার নাম ছিল ধর্মগঞ্জ।

১১৯৭ - ১২০৩ খৃ. বখ্তিয়ার খিল্জী নালন্দা বিক্রমশিলা উদ্দণ্ডপুর প্রভৃতি ধ্বংস, সব গ্রন্থাদি অগ্নিতে ভস্মসাৎ এবং সব ভিক্ষুদের হত্যা করেন। উঁচু দেওয়ালঘেরা মহাবিহারগুলিকে তিনি দুর্গ মনে করিয়াছিলেন এবং ভিক্ষুগণকে হত্যার পর দেশ জয় হইয়া গিয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এইসব স্থানের যাবতীয় মূল্যবান বস্তু, মূর্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তাঁহার সৈন্যেরা লুঠ করে। মুসলমান ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, পুঁথিগুলিতে কি বিষয় লিখিত আছে বখ্তিয়ারের জানিবার ইচ্ছা হইলে পুঁথি পড়িতে পারে এমন একজন লোকও পাওয়া যায় নাই। ভিক্ষুরা সকলে নিহত হইয়াছিলেন ও অন্য সব শিক্ষিত ভদ্রলোক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

তিব্বতী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মুসলমানদের আক্রমণের পর ভিক্ষু মুদিতভদ্র আবার বিহার-সংস্কার ও নির্মাণ করেন এবং তাহার কিছুদিন পরে মগধরাজমন্ত্রী কুক্কুটসিদ্ধ কর্তৃক এখানে একটি চৈত্যস্থাপন-উৎসবোপলক্ষে ধর্মোপদেশের সময়ে দুইজন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক এখানে আসিয়া ক্রোধ প্রকাশ করায় কয়েকজন তরুণ ভিক্ষু ইঁহাদের মাথায় ময়লা জল ঢালিয়া দিলে ব্রাহ্মণদ্বয় সূর্যপূজা ও যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞকুণ্ডের জ্বলন্ত কয়লা ফেলিয়া মহাবিহারে আগুন লাগাইয়া দেন। এখনও বিহারের কয়েকটি দরজা সিঁড়ি প্রভৃতিতে এইসব একাধিক অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন দেখা যায়।

ধ্বংসাবশেষ

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হইতে ধ্বংসাবশেষগুলিতে নম্বর দেওয়ার বর্ণনার সুবিধা হইয়াছে। এখন পর্যন্ত যেসব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রাচীন মহাবিহারের একাংশমাত্র। আবিষ্কৃত বাড়িগুলির মধ্যে পশ্চিমদিকেরগুলি চৈত্য, পূর্ব ও দক্ষিণদিকেরগুলি বিহার ও মন্দির, এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণেরটি স্তূপ ছিল।

প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে একাধিক স্তর পাওয়া গিয়াছে। কালবশে বা অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হইলে বিনষ্ট গৃহের অবশিষ্ট ইঁটপাথরভিত্তি ও দেওয়ালের রাশি সরাইয়া না ফেলিয়া তাহা ভরাট ও সমান করিয়া তাহারই উপর নূতন বাড়ি নির্মিত হইয়াছিল। যুগে যুগে এইরূপ বিনাশাবশেষের উপর নবনির্মাণে স্তরগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনষ্ট গৃহের পরিকল্পনা যেরূপ ছিল, নবনির্মাণও সেই 'প্ল্যানেই'

করা হইত। বিহারগুলির প্রত্যেক স্তরে প্রায়ই দুই বা ততোধিক তলার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

আমরা প্রথমে দক্ষিণের ১এ ও ১বি বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বদিকের বিহার - মন্দিরগুলি দেখিয়া পরে পশ্চিমের চৈত্যগুলি দেখিব এবং সর্বশেষে দক্ষিণ - পশ্চিমের স্তূপটি দেখিব।

বিহারগুলির প্রবেশদ্বারের কাছের চোরকুঠুরিতে দানপ্রাপ্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখা হইত। ভিতরে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের শেষপ্রান্তে সমুচ্চ প্রতিমাবেদী, চারপাশে ভিক্ষুদের বাসকক্ষের সারি, কোন কোন কক্ষে বায়ু ও আলোক প্রবেশের জন্য "স্কাই লাইট", দরজায় চৌকাঠের বদলে খিলান, জলনিকাশের জন্য ড্রেন, কূপ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

১নং বিহারে ৯টি স্তরের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে ; ইহার প্রাঙ্গণের প্রতিমাবেদীর পুরোভাগে স্তম্ভযুক্ত যে চাতালটি দেখা যায় সম্ভব তাহাতে উপবিষ্ট অধ্যাপক প্রাঙ্গণস্থ ছাত্রদের অধ্যাপনা করিতেন।

২নং প্রস্তর - মন্দিরটিতে রাজসাহী - পাহাড়পুরের মন্দিরের মত অনেক মানুষ পশুপক্ষী দেবদেবী প্রভৃতির মূর্তি খোদিত দেখা যায় ; সম্ভব এগুলি ৬ - ৭ শতকে খোদিত এবং অন্য মন্দির হইতে আনিয়া এখানে সংযুক্ত হইয়াছিল কারণ বর্তমান মন্দিরটি ৭ শতকের পরে নির্মিত বলিয়া মনে হয়।

৫নং বিহারটি একটি প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষ, ইহা ৪নং বিহারের পিছনে (পূর্বে) অবস্থিত।

৬নং বিহারের উপরতলার প্রাঙ্গণে যে উনানগুলি দেখা যায়

তাহাতে রান্না বা ছাত্রদের কিছু (বোধ হয় কোন রাসায়নিক বিষয়) শিক্ষা দেওয়া হইত।

১১নং বিহারের পর আমরা পশ্চিমদিকের চৈত্যগুলিতে যাইব।

১৪নং চৈত্যের প্রতিমার নিম্নগাত্রে চিত্রাঙ্কণের চিহ্ন দেখা যায়; উত্তর - ভারতে দেওয়াল - চিত্রের (fresco) যে স্বল্প কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে ইহা তাহার অন্যতম।

১৩নং চৈত্যের উত্তরে যে উনানগুলি দেখা যায় তাহা ধাতু গলাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত; ধাতুমূর্তি নির্মাণ নালন্দার একটি শিক্ষা - বিষয় ছিল। ১২নং চৈত্যের পর আমরা ৩নং স্তূপে যাইব।

৩নং স্তূপটিতে ৭টি স্তর পাওয়া গিয়াছে। ইহা প্রথমে ছোট আকারে সম্ভব ৪ শতকে স্থাপিত হয় এবং তারপর প্রত্যেক পুনর্নির্মাণের সময়ে কিছু কিছু করিয়া বাড়ান হয়। ৫ম স্তরটি ৬ শতকের, এই স্তরটিই সবচেয়ে ভাল অবস্থায় আছে। উত্তর দিকের সিঁড়ি তিনটি ক্রমান্বয়ে ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্তরের। এই স্তূপটির প্রতি এত যত্ন ও এতবার ইহার পুনর্নির্মাণ দেখিয়া মনে হয় ইহা সম্ভব বুদ্ধের অথবা সারিপুত্রের ধাতুস্তূপ ছিল। এই পুস্তিকার মলাটের ছবিটি এই স্তূপের ফটো।

মহাবিহারের চারদিকের গাছতলা ধানক্ষেত পুকুরঘাট প্রভৃতিতে অনেক ছোট বড় মূর্তি পড়িয়া আছে দেখা যায়। নিকটবর্তী বড়গাঁও ('বিহারগ্রাম' হইতে এই নামের উদ্ভব হইয়াছে) গ্রামে একটি আধুনিক সূর্যমন্দিরে কিছু মূর্তি রক্ষিত হইয়াছে। বড়গাঁও হইতে উত্তরে বেগমপুর গ্রাম পর্যন্ত ভূভাগের মধ্যে যে বড় বড় ঢিবিগুলি দেখা যায় তাহা প্রাচীন ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ; ঐ স্থান ছিল প্রাচীন নালন্দার

উত্তরপ্রান্ত। সে যুগের নালন্দা যে কত বিস্তীর্ণ ছিল তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। [মহাবিহারের দক্ষিণ - পশ্চিমে ২ মাইল দূরস্থ জগদীশপুর গ্রামে একটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি আছে।]

মিউজিয়ম

নালন্দা খননের সময়ে প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যাদির কিছু কিছু অদূরস্থ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। সব সামগ্রীতে বর্ণনা ও কালপরিচয় লিখিত আছে।

নালন্দা - শিল্পীরা পাথরের চেয়ে ধাতুমূর্তি নির্মাণেই বেশি যত্নবান ছিলেন এবং বৃহৎ মূর্তি নালন্দায় অনেক থাকিলেও ছোট মূর্তিতেই তাঁহাদের আগ্রহ বেশি ছিল। বিভিন্ন মুদ্রায় বুদ্ধ, বোধিসত্ত্বগণ, তান্ত্রিক - বৌদ্ধ দেবদেবী ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিগুলির অধিকাংশই পালযুগের নির্মাণ। পালযুগের বৌদ্ধধর্মে গুপ্তযুগ অপেক্ষা অনেক নূতন দেবদেবীর উদ্ভব ও আসন - মুদ্রাদির প্রকার - বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং পালযুগে নালন্দায় নির্মিত দেবদেবী-মূর্তি নেপাল তিব্বত ও পূর্বসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ছড়াইয়া পড়ে। গুপ্তযুগের শিল্পের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভিতরের ভাব ফুটাইয়া তোলা কিন্তু পালযুগের শিল্পে প্রাধান্য পাইয়াছিল বাহ্য সৌকুমার্য সৌষ্ঠব ও কারুকার্য।

মিউজিয়মে রাজা, রাজকর্মচারী, সাধারণ ব্যক্তি ও মহাবিহার - কর্তৃপক্ষের অনেক শীলমোহর আছে। মহাবিহারীয় শীলগুলিতে "শ্রীনালন্দা - মহাবিহারীয়ার্য - ভিক্ষুসঙ্ঘস্য" কথা খোদিত আছে।

বৌদ্ধমন্ত্র - খোদিত অনেক ইষ্টক নালন্দার স্তূপাদিতে পাওয়া

গিয়াছে ; এগুলিতে "যে ধর্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতো হ্যবদৎ, তেষাং চ যো নিরোধ, এবম্বাদী মহাশ্রমণঃ" — অর্থাৎ "হেতুপ্রভব যে ধর্মসমুদায়, তাহাদের হেতু তথাগত বলিয়াছেন এবং তাহাদের যাহা নিরোধ, তাহাও (তিনি বলিয়াছেন), মহাশ্রমণ এইরূপ বলিয়াছেন" এই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্ত্র খোদিত আছে। কোন ইষ্টকে ইহার চেয়ে দীর্ঘতর প্রতীত্যসমুৎপাদ - সূত্র (যাহাতে বুদ্ধ ভবদুঃখোৎপত্তির কারণ ধারা - বাহিকরূপে বলিয়াছেন) খোদিত আছে। বৌদ্ধভক্তগণ পুণ্যলাভের ও ইষ্টসিদ্ধির জন্য এইসব মন্ত্রখোদিত ইষ্টক স্তূপে রক্ষা করিতেন।

মালাদ ও বিপুলশ্রীমিত্রের পূর্বোল্লিখিত শিলালিপিদ্বয়ও মিউজিয়মে দেখা যাইবে।

রাজগৃহ - নালন্দার ভবিষ্যৎ

রাজগৃহে খনন পুনরুদ্ধার প্রভৃতি কাজ কিছুই প্রায় হয় নাই। এখানকার সমস্ত বনজঙ্গল সম্পূর্ণ দূর করিয়া প্রাচীন রাস্তাগুলিকে পুনরুদ্ধার ও সংস্কার করিয়া ঘুরিয়া দেখিবার সুবিধার জন্য যানোপযোগী করা আবশ্যক। তারপর গভীর ও ব্যাপকভাবে খননাদির দ্বারা নগরের প্রাচীনরূপ যতটা সম্ভব পুনরাবিষ্কার করা কর্তব্য এবং প্রয়োজনীয় মেরামত প্রভৃতি দ্বারা তাহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হওয়া কর্তব্য।

আবিষ্কৃত বাড়িঘর রাস্তাঘাট প্রভৃতির যথাসম্ভব পরিচয় যথাস্থানে লিখিয়া দেখান উচিত। কোনও বিশেষ স্থানে সিমেন্ট বা প্লাষ্টার-নির্মিত একটি বৃহদাকার মানচিত্র স্থাপন আবশ্যক।

বৌদ্ধ - জৈন শাস্ত্র ও প্রাচীন ভারতেতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি - সমন্বিত একটি পুস্তকালয় স্থাপন কর্তব্য। প্রত্নসামগ্রীর একটি মিউজিয়ম হওয়া প্রয়োজনীয়।

প্রদর্শকের কাজ করিবার জন্য লিখনপঠনক্ষম লোককে শিক্ষাদান ও পরীক্ষার পর লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট দিয়া বাঁধা হারের পারিশ্রমিকে দর্শকদের দেখাইবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বিদেশী যাত্রিগণ, বিশেষত অদ্ভুতবেশধারী অদ্ভুতমূর্তি তিব্বতী - নেপালী, সিকিমী - ভুটানী প্রভৃতি বৌদ্ধ ভক্তগণ এখানে বাড়িওয়ালা - পাণ্ডা - দোকানদার ও রাস্তার ছোক্‌রাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়, ইহার প্রতিকারের জন্য পুলিশ ব্যবস্থা ও লোকশিক্ষা হওয়া প্রয়োজন।

অবস্থাসম্পন্ন দর্শকদের বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত সরঞ্জামসহ হোটেল ও গৃহাদি সরকার হইতে নির্মিত হওয়া আবশ্যক এবং ট্যাক্সি, সাইকেল, রিক্‌শা প্রভৃতি যানবাহনের ব্যবস্থাও কর্তব্য।

জল চিকিৎসার জন্য যাঁহারা রাজগৃহে আসেন, তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য পাশ্চাত্য দেশের "স্পা"র (Spa) মত চিকিৎসালয় ও বাসগৃহ প্রভৃতি স্থাপিত হওয়া উচিত। ধারা ও কূপের জল বোতলবদ্ধ করিয়া বিদেশী "মিনারেল ওয়াটারের" মত অন্যত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা আবশ্যক।

নালন্দা - রাজগৃহের মধ্যে ও নালন্দা ষ্টেশন হইতে ধ্বংসাবশেষ পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য যানবাহনের উন্নতি আবশ্যক। নালন্দায় মিউজিয়ম ও ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি স্থানে বাসগৃহ ও হোটেল প্রভৃতির, অন্ততঃ চা-পানালয়ের ব্যবস্থা আবশ্যক।

প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার ও চর্চা সভ্যদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ। উপরন্তু বাসস্থান - যানবাহন - আহারাদির সুব্যবস্থা হইলে দেশ - বিদেশ হইতে দর্শকগণ রাজগৃহ নালন্দায় আসিয়া দেশের অর্থবৃদ্ধি করিবেন।

নালন্দার সন্নিকটে "নবনালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়" নামে একটি আধুনিক শিক্ষা - প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া উচিত। ইহাতে আধুনিক সাহিত্য দর্শনাদি, বিশেষত আধুনিক বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা, কারখানা প্রভৃতি বিদ্যায় শিক্ষাদান - ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারতবিদ্যাবিহার

২১ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জনানাম্ ইহ সর্বেষাং সর্বশ্রেয়ঃসমৃদ্ধয়ে
সর্বত্র সর্বদাস্মাকং ভূয়াদ্ ভারতসংস্কৃতিঃ।

উদ্দেশ্য :

বিচার তুলনা ও যুক্তিমূলক প্রণালীতে এবং ইতিহাস - ভাষাতত্ত্বাদির আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রাচীন - ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবিধ দিক সম্বন্ধে গবেষণা, চর্চা ও শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে তাহার বিস্তার।

কর্ম-সমিতি :

ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ

ডক্টর শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, আশুতোষ কলেজ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস, স্কটিশ্ চার্চ্ কলেজ

শ্রীকালিদাস মুন্সি

শ্রীবরেন্দ্রপ্রসাদ রায়, এম. এ., সলিসিটার

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

ডক্টর শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন, সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক বিবৃতি-শীর্ষের সংস্কৃত মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি রচনা করিয়া দিয়াছেন।

মূল্য এক টাকা বারো আনা